অ । লৌ । কি । ক

লৌকিক

GB12787

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

নতুন প্রকাশক
কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশিকা
এ, দত্ত
২৪ সি, রামকমল সেন লেন
কলিকাতা—৭

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর
শ্রীমোদনারায়ণ দাস
মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড
১১৪।১১৬ বলরাম দে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬

বাইণ্ডার্স
জাগ্রত বাইণ্ডার্স
৩৩সি, জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬

দু' টাকা আট আনা মাত্র

শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

শুভদৃষ্টি

ছোট একটি জংশন স্টেশন। শীতের রাত্রি গভীর। অনেক দূরের পল্লী হইতে গাড়ী ধরিতে আসিয়াছি। পথে গরুর গাড়ীর একটি চাকা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, গাড়ী ফেল করিলাম। আবার সেই শেষ রাত্রে গাড়ী। এখনো পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে ওয়েটিং রুমটি খোলা ছিল, অন্যান্যবারের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ওয়েটিং রুম বন্ধ থাকে, খুলিয়া দিতে বলিলে স্টেশন মাষ্টার বলে—তাইতো চাবিটা কোথায়! বিছানা ও বাক্স ওয়েটিং রুমের দরজার কাছে রাখিয়া ঘরে ঢুকিলাম। একটা পুরাতন টেবিলের উপরে বড় একটা কেরোসিনের ল্যাম্প, জ্বলিতেছে সন্দেহ নাই নতুবা এত ধোঁয়া উঠিবে কেন? পাশেই একখানা আরামচেয়ার। সেখানার উপরে বসিলাম। রেলওয়ে ওয়েটিং রুমের একটি বিশেষ গন্ধ আছে, বার্নিশ, ফিনাইল, ও বদ্ধ আবহাওয়ায় মিলিয়া একটি বিচিত্র মিশ্র গন্ধ নাকে আসিল, বুঝিলাম বড় স্টেশনই হোক আর ছোট স্টেশনই হোক গন্ধটির বড় তারতম্য ঘটে না। ঠাণ্ডা আসিতেছিল, দরজা ভেজাইয়া দিলাম এবং গায়ের কাপড় বেশ টানিয়া লইয়া ঘুমাইবার আয়োজন করিলাম, সেই ভোর রাত্রে গাড়ী—খানিকটা ঘুমাইলে ক্ষতি নাই।

বোধকরি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, নতুবা স্বপ্ন দেখিলাম কিভাবে, আবার না ঘুমাইলে জাগরণই বা কিভাবে সম্ভব? জ্যামিতির এক ডিগ্রি কোণে পিঠ থাকিলে জাগরণটাই স্বাভাবিক, ঘুমটাই বিস্ময়কর। জাগিয়া দেখি ল্যাম্পটা বিসুভিয়াস পাহাড়ের মতো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ। উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া দিলাম—কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকিল। আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। রাত্রি কত কে জানে, স্টেশনে কোন সাড়া শব্দ নাই, বোধকরি শেষ রাত্রের আগে উজানভাটির কোন গাড়ী নাই, তাই সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে পাশের ঘর হইতে

টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার ইঙ্গিত স্মরণ করাইয়া দেয় আমরা বিচ্ছিন্ন নই, মানব সংসারের সহিত সংযুক্ত। চারিদিকে বিস্তৃত মাঠ, এখানে ওখানে পুঞ্জিত অন্ধকারে গাছপালার অস্তিত্ব—কিন্তু সেখানেও নিস্তব্ধতা, কেবল মাঝে মাঝে এক-আধবার শিবাধ্বনি! শুধু আকাশের তারাগুলির কয়েকটা দরজার ফাঁক দিয়া দৃশ্যমান! হঠাৎ মনে হয় কাল-স্রোতের বাহিরে যেন কোন মহাশূন্যে আসিয়া পড়িয়াছি, কেমন একটা ভীত-বিস্ময়ের ভাব চাপিয়া ধরিতে চায়। সহসা ঘরের কোণে একটা শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি আর-একটা আরাম-চেয়ারের উপরে একটি লোক সোজা হইয়া বসিয়া আছে। ঘরে আর একখানা চেয়ার ছিল দেখিয়াছিলাম, কিন্তু লোকটিকে দেখি নাই, হয়তো ঘুমাইলে পরে আসিয়াছে, হয়তো ওখানেই ছিল, কেবল শুইয়াছিল তাই লক্ষ্য করি নাই, ল্যাম্পে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী।

প্রথমে সেই লোকটাই কথা বলিল, সে বলিল, আমি গোড়া থেকেই আছি, আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে দেখছি।

এবারে তাহাকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলাম। অনেক দিন টব চাপা পড়িয়া থাকিলে ঘাসগুলো যেমন বিবর্ণ সাদা হইয়া যায় তেমনি একপ্রকার শুভ্রতা তাহার মুখে, চোখ দুটাতে তীব্র জ্যোতি, তাহাও স্বাভাবিক নয়।

লোকটি বলিল—নাঃ, আর ঘুম হইবে না, তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চেয়ারখানা টানিয়া কাছে আনিল। এবারে আরও ভালো করিয়া তাহাকে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। শীর্ণ চেহারা অথচ রুগ্ন নয়, বিবর্ণ মুখে দীপ্ত চোখ। ও চোখ যেন ও মুখের নয়। লোকটির কণ্ঠস্বরেও একটা অস্বাভাবিকতা আছে, মানবকণ্ঠের মূর্ছনার যেন অভাব।

লোকটি দীপ্ত চোখ আমার উপরে স্থাপন করিয়া বলিল—কখনো ভূত দেখেছেন?

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আর দশ জন লোকের চেয়ে আমি যে বেশী ভীরু তা নয়, কিন্তু স্থান কাল পাত্রের বিষয় স্মরণ করিলে পাঠক আমার ভয়ের কারণ অনুমান করিতে পারিবেন।

আমি হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলাম না, কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, সে আবার শুধাইল—ভূতে বিশ্বাস করেন?

একবার ভাবিলাম, এই লোকটাই তো—তখনি মনে মনে হাসি পাইল, এ কি পাগলামি আমার মাথায় চাপিয়াছে। বুঝিলাম কিছু উত্তর দেওয়া উচিত, বলিলাম, না।

লোকটি বলিল—আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। তারপরে বলিল—আমি দেখেছি।

ভাবিলাম, তবু ভালো যে তুমি নিজে ভূত নও।

তখন সে বলিল, গাড়ী আসতে তো দেরী আছে, সেই শেষ রাত্রে, আপনাকে ঘটনাটি বলি, শুনলে বুঝবেন ভূত অবশ্যই আছে।

মনে মনে ভাবিলাম—গভীর রাত্রে এ কি পাগলের হাতে পড়িলাম। বুঝিলাম, ভূত না থাকিলেও সংসারে পাগলের অভাব নাই। পাগলের হাতেই পড়িয়াছি। তবু শুনিতে আপত্তি কি, সময় কাটিবে তো।

লোকটি আরম্ভ করিল—আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম—

বিরক্ত হইয়া ভাবিলাম সেই চিরন্তন প্রেমের কাহিনী।

লোকটি আমার চিন্তার সূত্র ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—ভাবছেন যে একঘেয়ে প্রেমের কথা বল্‌তে যাচ্ছি! তা নয়, আগে শুনুন, তারপরে যা ভাববার ভাববেন।

আবার সে আরম্ভ করিল।

একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। প্রথম দৃষ্টিতেই যে তাকে ভালোবেসে ছিলাম এমন নয়। অনেকদিনের পরিচয়ের শেষে ভালোবাসার সেই দৃষ্টি এসেছিল। যেন হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, এতদিন অন্ধকারে যেন পরস্পরকে দেখেছিলাম, সেদিন যেদিন ঐ আলো জ্বলে উঠল, পরস্পরের মন বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়লো, যেমন চোখে পড়ে ঝরণার নুড়িগুলো চাঁদের আলোয়।

এখানে একটু থামিয়া কি যেন মনে করিয়া লইল, আবার আরম্ভ করিল—হাঁ, সেদিন জ্যোৎস্না রাতই ছিল বটে, আমরা বেড়িয়ে ফিরছিলাম, সঙ্গীরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, চারিদিক নিস্তব্ধ, নির্জন তো বটেই, তালগাছের মসৃণ পাতাগুলো জ্যোৎস্নায় যেন পেখম মেলে রাত্রির শোভা দেখে হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নাচতে ভুলে গিয়েছে, মাঠের উপরে জ্যোৎস্নার ফুল ছড়াচ্ছে, কালো দিগন্তের রেখাটাকে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে ধুয়ে যেন ক্ষীণ ক'রে ফেলেছে, আর দুই পোঁচ পড়লেই সেটা সম্পূর্ণ মুছে যাবে। হঠাৎ আমার

মনে কি পরিবর্তন ঘটে গেল, মনে হ'ল এতদিন শুধু দীপ ছিল এবারে আলো জ্বলল। কি করছি ভালো ক'রে বোঝবার আগেই তার হাত ধরে ফেলে বল্লাম, তোমাকে ভালোবাসি। সে হাত ছাড়াতে চাইলো না, আগে হ'লে চাইতো, এমন কতবার ছাড়িয়েছে। সে কোন উত্তর দিল না। তার চোখের দিকে তাকালাম, স্তিমিত চোখ দুটিতে যেন দুটি শিউলির কুঁড়ি ফুটে উঠ্‌বার চেষ্টা করছে ; তাদের উপরে ভোরের আলো পড়েনি অথচ ভোরের শিশিরের ছোঁয়াচ লেগেছে। ঠোঁটের উপরে একটুখানি স্বচ্ছতার মতো সে কি জ্যোৎস্নার আভাস না হাসির আভা আজো বুঝতে পারিনি। মরীচিকা যেমন কাঁপে অথচ চলে না তেমনি এক-রকম চঞ্চলতা তার সারা অঙ্গে। তার সেই নীরবতায় আমার কথার জবাব পেলাম। কথায় এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট ক'রে আর কি বলা যেতো!

লোকটি বলিয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না, যেন সে প্রশ্ন নিজেরই কাছে, কাহিনীটা যেন নিজেকেই বলিতেছে, সমস্তই যেন সুদীর্ঘ এক স্বগতোক্তি। আমার একবার মনে হইল, সে বোধ করি আমার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাঝে মাঝে উজ্জ্বল চোখ দুটি আমার উপর পড়িয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে আমাকে ভোলে নাই।

লোকটি বলিতেছে—দু জনে দু'জনের মনের ভাব বুঝলাম। এবারে বিয়ের কথা মনে উদয় হ'ল। যারা মনে করে দু'জন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসে আর বিয়ের কথা মনে করে না—তারা কিছুই জানে না। যে-প্রণয়ীযুগলের বাস্তবে বিয়ে হ'তে পারলো না, তারা কল্পনায় হাজার বার বিয়ে করে। এতেই বোঝা যায়, বিবাহটা সামাজিক সংস্কারমাত্র নয়, প্রেমের অবস্থাভেদ।

আমি এবার বাধা দিলাম, বলিলাম, যা বলেছেন সবই ঠিক, কিন্তু ভূত কোথায়?

সে ব্যস্তমাত্র হইল না, বলিল, আসছে অপেক্ষা করুন।

অপেক্ষা তো করিয়াই আছি।

সে বলিল—কিন্তু বিয়ে আমাদের হবার উপায় ছিল না, দু'জনের বাড়ী থেকেই আপত্তি উঠল। আমি পুরুষ মানুষ, আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কাপুরুষ আমি—

অনেকক্ষণ আর কথা বলিতে পারিল না, তুই হাতে মাথা ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সে বলিতে লাগিল—তু'দশ দিন পরেই বুঝ্‌লাম বিয়ে হবার নয়। অন্যত্র আমার বিয়ের কথা হ'তে লাগলো, নমিতা, হাঁ, ঐ তার নাম ছিল—অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। পাশের গ্রামেই তাদের বাড়ী; খবর শুনলাম তার ক্রমেই অসুখ বাড়ছে, কিন্তু দেখা হ'বার আর কোন উপায় ছিল না, কোন্‌ মুখে দেখা করতে যাই।

এবারে আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, আপনি বোধ হয় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন—ভালো—আমি খুব সংক্ষেপে সারবো। অন্যত্র আমার বিয়ে স্থির হ'য়ে গেল। আত্মীয়েরা বলল, মেয়ে দেখবে? আমি অস্বীকার করলাম। একখানা ছবি তারা দিল। মেয়েটা সুন্দরী বটে। তারপরে একদিন বিয়ে করতে চললাম, যাবার আগে শুনে গেলাম নমিতার অসুখ বেড়েছে।

বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ল। শুভদৃষ্টির সময়ে তু'জনের মাথার উপর দিয়ে চাদর ফেলে দিল—ঠিক সেই সময়ে বিবাহ সভায় গ্যাসের আলো ক'টা গেল নিভে। কন্যাপক্ষের একজন বধূর মুখের ঘোমটা সরিয়ে দিল—আমি তাকালাম। কি এ কি? কি দেখলাম? এ কার মুখ? এ যে নমিতার মুখ? শীর্ণ পাণ্ডুর—কিন্তু ঠিক সেই মুখ! মনে হ'ল আমার চোখ ভুল দেখেছে। আর-একবার দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম। নতুন বধূকে ভালো ক'রে দেখবার আগ্রহ প্রকাশে বন্ধুরা হাসাহাসি করলো—কিন্তু আর-একবার না দেখে ছাড়লাম না। সেই মুখ। মুদ্রিতচক্ষু বধূর মুখে রুগ্ন নমিতার ছায়া। ভুল হ'তেই পারে না। ফটোগ্রাফে বধূর যে মুখ দেখেছিলাম—এ মুখের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো, শরীর কাঁপতে লাগলো, শীতের রাত্রে কপালে ঘাম দেখা দিল! ভাবতে লাগলাম—এ কি দেখলাম। কিন্তু এ সব কথা তো কাউকে বলা যায় না—চুপ ক'রে থাকলাম।

তারপরে তু'জনে বাসরঘরে এসে বসলাম। হঠাৎ নূতন বধূ অসুস্থ বোধ ক'রে শুয়ে পড়লো—তার ফিট হ'ল, ক্রমে সে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়লো, ডাক্তার এল—কিন্তু সে আর সংজ্ঞা ফিরে পেল না। শেষ রাত্রে সে গতপ্রাণ হ'ল। এবার ভালো ক'রে তার মুখ দেখতে পেলাম। সেই মুখের ছায়া

তার মুখমণ্ডলে। তার আত্মীয়স্বজনেরা অবধি বলাবলি ক'রতে লাগলো কমলার চেহারা যেন কেমন হ'য়ে গেছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে আবার থামিল। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—তারপরে আর কি! সকালবেলা একাকী ফিরে গেলাম। ফিরবার পথে ভাবলাম একবার নমিতার খবর নিয়ে যাই। তাদের গ্রামে ঢুকতে গিয়েই সংবাদ পেলাম নমিতার মৃত্যু হয়েছে, ঠিক যে-সময় কমলার মৃত্যু হ'য়েছিল সেই সময়েই নমিতা মারা গিয়েছে। তখন মনে হ'ল—শুভদৃষ্টির দেখা আমার চোখের ভুলমাত্র নয়, নমিতা আমাকে দেখা দিতেই গিয়েছিল।

তারপর থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও টিকতে পারি না, কে যেন তাড়া ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

তারপরে শুধালো—এবারে ভূতে বিশ্বাস হ'ল কি?

কি উত্তর দিব ভাবিতেছি এমন সময়ে আলোটা বারকয়েক দপ্ দপ্ করিয়া হঠাৎ নিভিয়া গেল। সেই নির্জন অন্ধকার কক্ষে তার কাহিনীটা বাস্তব বলিয়া মনে হইতে শুরু করিল। এমন সময়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—ঐ যে, ঐ যে—বলিয়াই দরজা দিয়া সবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম সে আর ফিরিল না। মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ মনে হইল ঘরটা অত্যন্ত বেশী ঠাণ্ডা, শরীরের ভিতরকার হাড়গুলি অবধি কাঁপিতে লাগিল। এমন সময়ে দরজার দিকে তাকাইতেই মনে হইল, সাদা কাপড় পরিয়া কে যেন দণ্ডায়মান! মাথা খারাপ হইল নাকি ভাবিয়া আর-একবার তাকাইলাম—না, দরজার ফাঁক দিয়া ভোরের আব্ছা আলো দৃশ্যমান, সাদা কাপড়ও নয়, মানুষও নয়। তবু শরীরের মজ্জার কাঁপুনি থামিল না।

যথাসময়ে গাড়ী আসিল, আমি রওনা হইয়া চলিয়া আসিলাম। আর দিনের আলো হইবামাত্র লোকটির কাহিনীকে পাগলামি বলিয়া মনে হইল, ভাবিলাম, আচ্ছা পাগলের হাতে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু কখনো অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে বসিয়া ঘটনাটি মনে পড়িলে তেমন অবাস্তব বোধ হয় না, মনে হয় কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে—জীবনের সব রহস্য মানুষের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত এমন কখনই হইতে পারে না।

স্বপ্নলব্ধ কাহিনী

লেখকজীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, লিখিবার কিছু না থাকিলেও লিখিতে হয়। শরীর খারাপ বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না, ভাবে ওটা বাড়াবাড়ি হইতেছে; সময় নাই বলিলে ভাবে ওটা চাপ দিয়া কিছু অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবার অজুহাত মাত্র। কাজেই হতভাগ্য লেখককে, যুগপৎ পিছনের ঠেলায় ও সামনের টানে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাইতে হয়। আমার লিখিবার অভ্যাস আছে, লেখার প্রেরণায় যে লিখি এমন মনে করিবার কারণ নাই, নিতান্তই আর কিছু করিতে পারি না বলিয়া লিখিয়া যাই। সেটা বিস্ময়ের নয়, বিস্ময় এই যে, এমন লেখাও সম্পাদকগণ কাঞ্চনমূল্যে কিনিয়া ছাপিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে সম্পাদকচক্রের ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ি, মাথাটা বিশ্রাম পায়। আমার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইবার সময় পূজার ছুটি, আকাশ যখন নির্মল হইয়া ওঠে, উত্তরে বাতাসে শিউলিফুলগুলি যখন স্নেহ-সম্ভাষণের মতো টুপ-টুপ করিয়া ঘাসের উপর পড়িতে থাকে, আর প্রত্যেক তৃণপল্লবের আগায় একটি করিয়া শিশির বিন্দু দেখা দেয়, সেই নিরাময় শরৎকালে আমি কিছুদিনের জন্য বাহির হইয়া পড়ি।

সেবার এই উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছি, জিনিসপত্র গাড়ীর কামরায় তোলা হইয়াছে, আমি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একটি চুরুট সবে ধরাইয়াছি—এমন সময়ে পিছন হইতে কে নাম ধরিয়া ডাকিল! ফিরিয়া দেখি—পত্রের সম্পাদক। ব্যাপার কি শুধাইবার আগেই ব্যাপারখানা কি তিনি আগেই জানাইয়া দিলেন—একটি গল্প চাই। বলিলাম, দেখছেন আমি তো বেরিয়ে পড়েছি। তদুত্তরে তিনি সন্তর্পণে কয়েকখানি নোট আমার মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বিনীতভাবে হাসিলেন, ভাবটা এই যে, এবারে তো হইল, আর কোন অজুহাত চলিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, নোট কয়খানা ফেরত দিবার মতো সৎসাহস আমার হইল না। বলিলাম, কিন্তু

কবে যে পাবেন স্থির নাই। সম্পাদক বলিলেন, যখন খুশি দেবেন, অর্থাৎ টাকা যখন একবার গিলিলেন তখন লেখা কি করিয়া আদায় করিয়া লইতে হয় তাহা যদি না জানি তবে সম্পাদকতা করিতেছি কেন? যাই হোক সম্পাদককে নমস্কার করিয়া বিদায় করিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সাধারণতঃ আমার নিরুদ্দেশ বাসের ঠিকানা কেহ জানিতে পায় না। তাহার কারণ বেড়াইতে বাহির হইবার কয়েকদিন আগে একবার অজ্ঞাতবাসের স্থান খুঁজিতে নিজে বাহির হই এবং অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গায় একটা লক্ষ্মীছাড়া আবাস নির্দিষ্ট করিয়া আসি। এবারে চলিয়াছি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে। পুরুলিরা হইতে টাটানগর পর্যন্ত ছোটনাগপুরের ভূখণ্ডে অনেকগুলি ছোটখাটো রেল স্টেশন আছে। তাহাদেরই মধ্যে এক জায়গাকে বাছিয়া লইয়াছি। জায়গাটি শুধু নির্জন নয়, এ যেন সংসার কর্তৃক সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দিনের মধ্যে খানকতক উজান ভাটি রেলগাড়ী পুরাতন স্মৃতির মতো হু হু করিয়া চলিয়া যায়, সবগুলি থামে না, তারপরই সব আবার পূর্ববৎ, নিস্তব্ধ, নির্জন, বিস্মৃত। স্টেশনটির নাম গোপন রাখিলাম, আরও একবার যাইবার ইচ্ছা আছে, সম্পাদকগণের কবলে পড়িতে চাই না।

প্রকৃত নাম গোপন করিয়া জায়গাটিকে বিরামপুর বলিয়া উল্লেখ করিব। বিরামপুরের স্টেশনমাষ্টার আমাদের দেশের লোক। তিনি আমার নির্জনবাসের অভ্যাস জানিতেন। এবার পূজার আগে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, একবার বিরামপুরে আসুন, ইহার চেয়ে নির্জনতর স্থান আর পাইবেন না। তাঁহার আহ্বানে বিরামপুরে গিয়া স্টেশন হইতে মাইল-খানেক দূরে একটি বাড়ী স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম। বাড়ীটি বৃহৎ, খুব পুরাতন না হইলেও পরিত্যক্ত পড়িয়া থাকায় অল্প বয়সেই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার বর্তমান মালিক বরাহভূমের এক ইংরাজ পাদ্রী। বাড়ীটি সে কিছুকাল আগে কিনিয়াছিল, কাহার কাছ হইতে জানি না। পাদ্রী সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে এখানে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করিবে। কিন্তু পরে মত পরিবর্তন করিয়া তাহা বরাহভূমে স্থাপন করিয়াছে। বরাহভূম স্টেশন এই লাইনেই, কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে। পাদ্রী সাহেবের কাছে নামমাত্র ভাড়ায় বাড়ীটি একমাসের জন্য লইয়াছিলাম। স্টেশন মাষ্টার

বলিলেন যে, আপনি আসিলে ঠাকুর ও চাকরের একজন 'কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড' নিযুক্ত করিয়া দিব।

হাওড়া হইতে রওনা হইয়া পরদিন বেলা দশটার মধ্যেই বিরামপুর আসিয়া পৌছিলাম। সে-বেলা স্টেশনমাষ্টারের বাসাতেই স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। বিকাল বেলা একখানা গরুর গাড়ীতে মালপত্র তুলিয়া লইয়া বাড়ীটির দিকে চলিলাম। সঙ্গে ানমাষ্টার চলিলেন। তিনি 'ঝরকু' নামে একজন স্থানীয় লোককে কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে আগেই গিয়া বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বাসযোগ্য করিতে লাগিয়া গিয়াছিল। মাঠ পার হইয়া আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ীতে গিয়া পৌছিলাম। স্টেশন ও বাড়ীটির মধ্যে একটি উচ্চ ভূখণ্ড, নতুবা এক স্থান হইতে অপর স্থানটি দেখা যাইত। বাড়ীর পাশে দাঁড়াইলে স্টেশনের সিগন্যাল বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পৌছাইতেই ঝরকু চা করিয়া আনিল। দুইজনে চা পান করিলাম। স্টেশনমাষ্টারবাবু প্রতিদিন একবার করিয়া আসিয়া খোঁজ লইয়া যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। আমি ভগ্ন প্রাসাদের একক অধীশ্বর হইয়া বারান্দায় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম।

বাড়ীটার সম্মুখে বাগান আছে, কিংবা ছিল বলাই উচিত। এখন তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে, দু'চারটি টগর, করবী ফুলের গাছ ছাড়া অন্য গাছ নাই। বাড়ীটির চারিদিক ঘেরিয়া টানা বারান্দা—মাঝখানে বড় একটি হল, দু'কোণে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। অদূরে পাকশালা, ভৃত্যনিবাস প্রভৃতি। কাছেই একটি ইঁদারা, ইঁদারার পাশে গোটা দুই মহুয়া ও অর্জুন গাছ। বাড়ীটি দেখিলে মনে হয় যে, সৌখীন লোকের হাতে তৈয়ারী হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাড়ীটির সুখের অবস্থা গত, এখন কোনরূপে খাড়া হইয়া আছে মাত্র। ভাবিলাম, আমি সুখের সন্ধান করিতে আসি নাই, নির্জনতা আমার কাম্য, এমন অজ্ঞাতবাসের স্থান আর পাইব না।

বাড়ীর বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিলে চোখের দৃষ্টি সুদীর্ঘ ছাড়া পায়, একেবারে বাধে গিয়া দিগন্তের গিরিমালায়। বাড়ীটার সামনেই একটি রিক্ত মাঠ—উঁচু হইয়া চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরেই প্রথমে চোখে পড়ে সুবর্ণরেখা নদীর অপর তীর, এদিকের তীরটা মাঠের স্ফীতির আড়ালে

গুপ্ত। নদীর পরপারে জনশূন্য, তৃণশূন্য, তরুগুল্ম-শূন্য দগ্ধ প্রান্তর, দিগন্তে সেই অনুর্বর, রুক্ষ পাহাড়ের প্রাচীর। এমন নেড়া পাহাড় জীবনে দেখি নাই, পাহাড় নয় যেন অতিকায় পুরীর ভগ্নপ্রাচীর, ভগ্নপ্রাচীরে যে শ্যামলতাটুকু দেখা যায় তাহারও অভাব। চারিদিকের এমন লক্ষ্মীছাড়া নির্জীব ভাব আর কোথাও দেখিয়াছি মনে পড়ে না। এক একবার মনে হয় যেন পরিচিত পৃথিবীর অংশ নয়, চন্দ্রলোকের মৃত জগতের একটা খণ্ড। কেবল স্বস্তি পাই আকাশের দিকে তাকাইলে—এমন স্বচ্ছ নির্মল নভঃকান্তি বাংলার লোকে কল্পনা করিতে পারিবে না। বাংলা দেশে পৃথিবীর শ্যামলতা আকাশের নির্মলতার প্রতিদ্বন্দ্বী—তাই শরতের আকাশও সেখানে পূর্ণ ঐশ্বর্য প্রকাশ করে না। আকাশের দিকে তাকাইয়া আমি কল্পনার ভেলা ভাসাই, তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া দেবকন্যাগণ মেঘের ভেলা ভাসায়—দুই-ই উদ্দেশ্যহীনভাবে নিরর্থকতার দিকে ভাসিয়া যায়।

এইভাবে দিন দুই যায়, বিকাল বেলা স্টেশনমাষ্টার আসেন, তাঁহার সঙ্গে স্টেশনে গিয়া জনসঙ্গের স্বাদ উপভোগ করিয়া আসি। জনসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে নির্জনতাকে আরও বেশি করিয়া পাই। সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্ফুটমান তারাপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া বারান্দায় থাকি। ঝরকু একাধিকবার তাড়া দিলে তবে উঠিয়া আহার করিতে যাই। আহারের পরে শয়ন। ছোট কামরা-দুটির একটিতে আমার শুইবার ব্যবস্থা। আর একটিতে বসি, লিখিবার কিছু সাজসরঞ্জামও সেখানে আছে।

দুই তিন দিন পরে একদিন জামার পকেটে হাত দিতেই কতকগুলো কাগজ খচমচ্ করিয়া অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল। তাহাদের টানিয়া বাহির করিয়া দেখি—তাহারা সম্পাদকের দেওয়া সেই নোটগুলি। সেই নোটের স্মৃতিতে সম্পাদক ও সংসারের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম আর বিলম্ব না করিয়া একটা কিছু লিখিয়া পাঠাইতে হয়, নতুবা সম্পাদক হয়তো এই অজ্ঞেয় স্থানে আসিয়া পড়িবে, সম্পাদকের কিছুই অসাধ্য নয়।

লিখি লিখি করিয়াও সারাদিন বসিতে পারি নাই, সন্ধ্যাবেলা মনকে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া লিখিতে বসিলাম। কি লিখিব স্থির ছিল না। একসময়ে ভাবিতে ভাবিতে লিখিতাম, এখন লিখিতে লিখিতে ভাবি, চলার

বেগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতেই আলো জ্বলে। ভাবিলাম এই বাড়ী ও মাঠের বর্ণনা দিয়াই আরম্ভ করা যাক না কেন। সরোবরে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা আমার কাজ, তারপরে তরঙ্গবলয় নিজের নিয়মেই ছড়াইয়া পড়িবে! রচনার প্রথম ধাক্কাটা লেখকের অধীন—তারপর হইতে লেখক নিয়মাধীন হইয়া পড়ে। যাইই হোক, এই মাঠ ও এই বাড়ীটির বর্ণনার পরিবেশ রচনা করিয়া কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিলাম, এবারে গল্পের সূচনা করিবার পালা—কিন্তু গল্পের সূচনার পূর্বেই নিদ্রার রচনা হইল। গল্পের ভার আগামীকল্যের উপর রাখিয়া নিদ্রাজড়িত চোখে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রির দ্বিগাণত নিস্তব্ধতার প্রান্তে শিবাধ্বনির প্রহর ঘোষণার সঙ্কেতটুকু মাত্র মনে আছে—তারপরে আর কোন সম্বিৎ রহিল না।

ঘুমাইয়া একটি স্বপ্ন দেখিলাম। অবশ্য ঘুমের মধ্যে স্বপ্নবোধ হয় নাই, জাগিয়া উঠিবার পরেই স্বপ্ন বলিয়াই বুঝিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি একটি উৎসব-ভাবাপন্ন বাড়ীতে গিয়া যেন ঢুকিয়াছি। চারিদিকে লোক-জনের যাতায়াত, আমি সকলকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমাকে কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না বা দেখিতে পাইতেছে না। আমি বাহির বাড়ী হইতে বাবুদের বৈঠকখানায় গেলাম। তারপরে আরও একটা মহল অতিক্রম করিয়া একেবারে অন্দরমহলে গিয়া পৌঁছিলাম। দেখিতে পাইলাম যে, পুরস্ত্রীগণের কেহ কেহ নিজেরা সাজিতেছে, কেহ কেহ বা গৃহসজ্জায় ব্যস্ত। তাহারাও যে আমাকে দেখিতে পাইতেছে এমন বোধ হইল না। তাহাদের কথাবর্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, এই বাড়ীর একটি মেয়েকে বরপক্ষ আজ দেখিতে আসিবে। তাই উৎসবের আয়োজন বটে। এবারে বিবাহের কনেটিকে দেখিবার কৌতূহল হইল। অন্দরমহলের দোতলার টানা বারান্দা দিয়া চলিয়াছি—আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া অবাধ অধিকার। ঈষদুন্মুক্ত একটি জানালাপথে দেখিলাম যে, তিন চারজন মিশ্র-বয়সের মেয়েরা মিলিয়া একটি তরুণীকে সাজাইতেছে। বুঝিলাম এইটিই বিবাহের কনে। এমন অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই, যেন ক্ষীরসমুদ্রের চাঁচি। যেমন শুভ্র, তেমনি সুকুমার। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মেয়েটির দুই চোখ হইতে জল ঝরিয়া তাহার

দুই গাল ভাসিয়া যাইতেছে। একটি বর্ষীয়সী মহিলা বলিতেছে—মা ইন্দিরা, আজকার দিনে চোখের জল ফেলে না।

মেয়েটির নাম তবে ইন্দিরা।

ইহার পরেই স্বপ্নের পটপরিবর্তন হইয়া গেল। ইন্দিরার বিবাহ সভা। বরকন্যা মুখোমুখি উপবিষ্ট। বরের চেহারা ভালো লাগিল না। দেখিতে সে সুপুরুষ নয়। কিন্তু সে অভিযোগ আমার নয়। তাহার মুখে চোখে শিক্ষা-দীক্ষার ছাপের অভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ হইতে আচার-ব্যবহার সব তাতেই কেমন একটা অমার্জিত রুচির আভাস। আর সবচেয়ে বেশি নজরে পড়িল--তাহার সর্বাঙ্গে, চোখে মুখে কেমন নির্লজ্জ ক্ষুধার ভাব! তাহার পাশে ইন্দিরাকে রজনীগন্ধার কুঁড়িতে রচিত একটি মূর্তির মতো বোধ হইতেছিল। ইন্দিরা নিস্পন্দ, নিষ্পলক, মূর্তিমতী নিষ্পাপ। মনে হইল এ রকম বি-সমের মিলন কখনই সুখের হইতে পারে না। ইহা কি পূর্বাভাসে ইন্দিরা জানিতে পারিয়াছিল, নতুবা সেদিন তাহার চোখে জল ঝরিয়াছিল কেন, নতুবা আজ তাহার মূর্তি শুভ্র অশ্রু-সমুদ্রের স্ফটিকীভূত পুত্তলির মতো বোধ হইল কেন?

আবার স্বপ্নের পটপরিবর্তন হইল। আমি যেন একটি নূতন বাড়ীতে আসিয়াছি। বাড়ীটি চেনা-চেনা মনে হইলেও ঠিক কোথায় দেখিয়াছি বুঝিতে পারিলাম না (স্বপ্নভঙ্গের পর বুঝিয়াছি বিরামপুরের বাড়ীটাকেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম)। রাত্রি তখন অনেক। আমি যেন একটা কক্ষের পর্দাটানা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম (পরে বুঝিয়াছি যে আমার বর্তমান শয়নকক্ষটিই দেখিয়াছিলাম)। পর্দা একটু ফাঁক করিয়া দেখিলাম, ফুলশয্যার বিছানা—কেহ নাই। মনে হইল, এ উচিত হইতেছে না। ফিরিয়া যাইব কিন্তু অদৃশ্য কণ্ঠের অর্ধশ্রুত স্বর কেবলই কানের কাছে বলিতে লাগিল—"ফিরিয়া যাইও না, ফিরিয়া যাইও না, সাক্ষী থাকিয়া যাও।" আমি মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া আছি—এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, পূর্ব-দৃষ্ট ইন্দিরাকে অনুসরণ করিয়া তাহার বর আসিতেছে। লোকটা বলিতেছে, শোবে এসো। বলিতেছে, এখনো কথা শোন। ইন্দিরা বলিতেছে, না, না, আজ থাক। বর বলিল, সে কি, আজ যে ফুলশয্যার রাত। ইন্দিরা তবু বলিল, কাল হবে। কাল হবে শুনিয়া লোকটা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল —জানো, আমি এখন তোমার মালিক; জানো, আমি যা খুশি করতে পারি।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—আমাকে তুমি চেনো না! আমি নিজের হাতে অনেক খুন করেছি, আমার বন্দুকের গুলি খুব সিধা চলে।

এ-কথায় ইন্দিরা ভয় পাইল বলিয়া মনে হইল না। সে শান্তভাবে বলিল—তবে তাই হোক, তোমার গুলি আর একবার সিধা চলুক, তাতেই আমার শান্তি।

ইন্দিরার উত্তরে লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া প্রস্থান করিল—বোধ হয় বন্দুক আনিতেই গেল। ইন্দিরা একটা টেবিলের উপর বাম হাতের ভর দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সপ্তমীর চাঁদের আলো জমাইয়া কঠিন করিয়া লইয়া কোন্ দিব্য-শিল্পী তাহার মূর্তি কুঁদিয়া রচনা করিয়াছেন।

আবার পটপরিবর্তন হইল। এবার কেবল কালের পরিবর্তন, স্থানের নয়। আমি পূর্ববৎ সেই জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। দেখিলাম, ফুলশয্যার একান্তে ইন্দিরা শায়িতা, নিদ্রিতা, শান্ত, শুভ্র, স্থকুমার, নিস্পন্দ তাহার দেহ যেন মন্দাকিনীর খানিকটা জমিয়া তুষারে পরিণত। কিছুক্ষণ পরে তাহার বর প্রবেশ করিল—পুরুষের এমন নির্লজ্জ ক্ষুধার মূর্তি দেখি নাই। সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—তবে যে বড় বড়াই করা হয়েছিল—আমার শয্যায় শোবে না! এখন! তোমার নাকি বন্দুকের ভয় নাই ?

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—ওঃ, ঘুমিয়ে পড়া হয়েছে! আচ্ছা কি ক'রে ঘুম ভাঙাতে হয় তা দেখাচ্ছি!

এই বলিয়া সে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো শয্যার উপরে, ইন্দিরার দেহের উপরে বলাই উচিত, লাফাইয়া পড়িল।

এ দৃশ্য আমার দেখা উচিত নয় বলিয়া যতই সরিতে যাই, সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আমাকে বলে—তুমি যাইও না, তুমি যাইও না, সাক্ষী থাকিবার জন্য তোমাকে আনিয়াছি।

লোকটা লাফাইয়া পড়িবার পরমুহূর্তে বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—এ কি! এ কি! এ কি হ'ল।

সে একবার ইন্দিরার মুখে, নাকে, বুকে হাত দিয়া অনুভব করিল, কোথাও কোন স্পন্দন নাই, আশার কম্পমাত্র নাই। সে ত্রাসে আর্তনাদ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিলাম, সত্যই বিষম। ইন্দিরার বাহু সে নিজের কণ্ঠে জড়াইয়া লইয়াছে, সে বাহুপাশ

হইতে লোকটা আর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না—বরঞ্চ মনে হইল, তরুণীর বাহুলতা লৌহবলয়ের মতো তাহার কণ্ঠ ক্রমশঃ আঁটিয়া ধরিতেছে। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখ-চোখ ক্রমে অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার দম বন্ধ হইবার মতো হইয়াছে, তাহার আর্তনাদ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে স্বর বন্ধ হইবার মতো হইল। এমন সময়ে 'দপ্' করিয়া ঘরের আলো নিভিয়া গেল। আমার স্বপ্ন মিলাইল।

পাশ ফিরিয়া তাকাইয়া দেখি—জানালা দিয়া শুকতারার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেখা যাইতেছে! আমি লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম! মনে হইল—এ কী দুঃস্বপ্ন। এ কী বীভৎস স্বপ্ন! স্বপ্ন যে এমন প্রত্যক্ষ, এমন নিবিড় হয়, তাহা আগে জানিতাম না! সারাটা সকাল ইন্দিরার ট্র্যাজেডি মনের মধ্যে করুণ সুরে গুঞ্জন করিতে লাগিল।

দুপুরবেলা আহারান্তে আমার অর্ধসমাপ্ত গল্পের কাছে গিয়া বসিলাম। খাতাখানা পূর্ববৎ ছিল। কিন্তু পাতা উল্টাইতেই বিস্মিত হইলাম! এ কি! এতগুলো পাতা লেখা হইল কি প্রকারে? আমি তো মাত্র চারখানা লিখিয়াছিলাম। পাতা গুণিয়া দেখিলাম আরও ছাব্বিশ পাতা কে লিখিয়াছে? কিন্তু লিখিল কে? হাতের লেখা তো আমারই দেখিতেছি! কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। শেষে ভাবিলাম, পড়িয়াই দেখি না কি লিখিল। খানিকটা পড়িয়াই ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম! এ যে আমার স্বপ্নে-দেখা কাহিনী। গত রাত্রে যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, যে-ভাবে দেখিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই লিখিত। আরও আশ্চর্যের এই যে হস্তাক্ষর আমারই। আর ভাষায় যা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহাও আমারই। তখন প্রত্যয় হইল—আর কিছু নয়, আমিই স্বপ্নের মধ্যে উঠিয়া আসিয়া গল্পটা লিখিয়া ফেলিয়াছি। যদিচ এমন অভ্যাস আমার ছিল না, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার নজিরের অভাব নাই। তখন অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলাম, ভাবিলাম মাঝে মাঝে এমন ঘটিলে মন্দ হয় না। সম্পাদকের একটা দেনা শোধ হইবার পন্থা হয়। গল্পটা পড়িয়া মন্দ লাগিল না। স্থির করিলাম—কালকের ডাকে সম্পাদককে পাঠাইয়া দিব।

বিকালবেলা স্টেশনমাষ্টারবাবু আসিলেন। তিনি কহিলেন, চলুন আজ সুবর্ণরেখার দিকে যাওয়া যাক।

আমি বলিলাম—সেই ভালো, ও দিকে একেবারে যাওয়া হয়নি।

বাড়ীর সামনে একটা মাঠ। মাঠটা উঁচু বলিয়াই নদীর তীর দেখা যায় না। মাঠ পার হইতেই সুবর্ণরেখা চোখে পড়িল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

স্টেশনমাষ্টারবাবু বলিলেন—এদিকে আসুন, একটা জিনিস দেখাই।

উঁচু তীর হইতে নীচে নামিতেই পাশাপাশি দুটো অনুচ্চ স্তম্ভ চোখে পড়িল। কাছে গিয়া স্তম্ভের গাত্রে সংলগ্ন শ্বেতপাথরে খোদিত লিপি দেখিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম!

স্টেশনমাষ্টার শুধাইলেন,—চমকালেন কেন?

—চমকাইনি, হোঁচট খেয়েছিলাম।

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখ অন্ধকার হইয়া আসিল। শ্বেতপাথরের কালো অক্ষরগুলো ধূর্জটির প্রমথকুলের মতো চোখের উপরে নাচিতে লাগিল—"ইন্দিরা রায়, মৃত্যু ২৮শে অগ্রহায়ণ, ফুলশয্যার রাত্রি।" তাহার পাশের স্তম্ভটিতে লিখিত—"ফণীন্দ্র রায়, মৃত্যু ২৮শে অগ্রহায়ণ ফুলশয্যার রাত্রি।"

আমি বসিয়া পড়িলাম। আমার স্বপ্নে লেখার থিওরী ধসিয়া পড়িয়া মনটা আবার অভাবিত সমস্যার সম্মুখে গিয়া পড়িল!

স্টেশনমাষ্টারবাবু আমাকে বসিতে দেখিয়া বসিলেন, বলিলেন—ফুলশয্যার রাত্রে বরবধূর একত্র মৃত্যু দেখে বিস্মিত হয়েছেন নিশ্চয়?

আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—হঁা।

তবে শুনুন—বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—যে বাড়ীটায় আপনি আছেন, সেখানেই এই ব্যাপার ঘটেছিল অনেক দিন আগে। এখানকা রপুরানো লোকদের মুখে এ কাহিনী শুনেছি। আরও শুনেছি যে, এ বাড়ীটা ফণীন্দ্র রায়েরই ছিল। তার মৃত্যুর পরে সেই পাদ্রীসাহেব কিনে নিয়েছে।

—মৃত্যুর কারণ কিছু শুনেছেন?

তিনি বলিলেন, অনেকে অনেক কথা বলে—কেউ বলে, নূতন বৌয়ের গয়নার লোভে ডাকাতে এসে গহনাপত্র লুট ক'রে নিয়ে গেছে। আবার কেউ

বা বলে—ফণীন্দ্র রায় নিজেই বধূকে হত্যা ক'রে শেষে আত্মহত্যা করেছে! মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র নাকি ভালো ছিল না!

শেষোক্ত মন্তব্য শুনিয়া অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—না, না, তা হ'তে পারে না।

স্টেশনমাষ্টারবাবু শুধাইলেন—কেন, আপনি কিছু শুনেছেন কি?

—ওটা এমনি বললাম।

তিনি বলিলেন—তা বটে, আপনিই বা শুনবেন কোথাথেকে? এসব অনেককাল আগেকার কথা।

তারপরে বলিলেন—চলুন ফেরা যাক। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভল্লুক বের হয়।

দু'জনে ফিরিয়া চলিলাম। তিনি ইন্দিরার কাহিনী বিস্মৃত হইয়া অন্যান্য তুচ্ছ কথা লইয়া পড়িলেন—কিন্তু সেদিকে আমার মন ছিল না। আমার মনের মধ্যে ইন্দিরার স্মৃতি একটি অলৌকিক শ্বেত ময়ূরীর মতো কলাপ বিস্তার করিয়া দিয়া ক্রমশঃ অন্য সব বিষয় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। মনে হইল ইন্দিরাই আমাকে তাহার ট্র্যাজেডির সাক্ষী হইবার জন্য করুণ আহ্বান জানাইয়াছিল, আমি সরিতে চাহিলেও সরিতে দেয় নাই। তাহার মৃত্যুর সত্যটা আর একটা মানুষকে জানাইবার জন্যই এতকাল তাহার আত্মা যেন আকুলিবিকুলি করিতেছিল। এতদিন পরে হয়তো ইন্দিরা শান্তি পাইল। যখন বাসায় ফিরিলাম, শরতের নৈশ আকাশ ইন্দিরার অশ্রুজলে ছাইয়া গিয়াছে, কত অশ্রু নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ইন্দিরার অশ্রু মুছিবার নয়, তারাপুঞ্জের অমর ভাস্বরতায় চিরকাল তাহা জ্বলিতে থাকিবে।

আয়নাতে

বহুদিন পরে অরুণের চিঠি পাইলাম। এম-এ পাশ করিবার পরে রংপুর জেলায় তাহার বাড়ীতে সে চলিয়া যায়—তারপর হইতে আর দেখা হয় নাই, লোকমুখে মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ পাইতাম বটে—চিঠি পাইলাম এই প্রথম। এম-এ পাশ করিবার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। অরুণের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে পড়িয়াছি, সে কেবল সহপাঠী মাত্র ছিল না, কলেজে পড়ার সময়ে আমাদের দুইজনের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছিল। তারপরে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। তাহার সাংসারিক অবস্থা আমার অজ্ঞাত ছিল না; জানিতাম যে সে জমিদারপুত্র, তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। আমি এখন ইস্কুল মাষ্টারি করি।

কিন্তু পাঠ্যজীবনের বন্ধুত্ব প্রায়ই কর্মজীবনের প্রবাহে ছিন্ন হইয়া যায়—তাই অরুণের নীরবতাকে সংসারের অনিবার্য নিয়ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতরূপে তাহার পত্র আসিল।

অরুণ পুরানোদিনের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিয়া আসন্ন বড়দিনের ছুটিতে আমাকে তাহাদের বাড়ী যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, কলিকাতার জীবনে তুমি অভ্যস্ত এখানে পাড়াগাঁয়ে আসিলে তোমার নিশ্চয় খুব ভালো লাগিবে।

কথাটা মিথ্যা নয়, পাড়াগাঁয়ের প্রতি নিষিদ্ধ ফলের ন্যায় একটা আকর্ষণ আমার আছে।

সে আরও লিখিয়াছে যে, তোমাকে পাড়াগাঁয়েই কাটাইতে হইবে না, ভ্রমণের প্রচুর অবকাশও পাইবে। সে জানাইয়াছে যে, জলপাইগুড়ি জেলায় সে একটি চা-বাগান কিনিয়াছে, আমি পৌঁছিলে আমাকে লইয়া সেখানে বেড়াইতে যাইবে। অরুণের চিঠিতে আছে—"ভাবিও না যে চা-বাগানের কাঠের ঘরে তোমাকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে—এখানে একটি প্রকাণ্ড

পুরাতন বাড়ীও ছিল, সেটাও কিনিয়াছি। কাজেই তুমি আরামেই কাটাইতে পারিবে। বাঘভালুকের ভয়ে রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে না।

সে-অঞ্চলের দৃশ্যের মনোরমতা উল্লেখ করিয়া নদী, পাহাড়, বন-জঙ্গল প্রভৃতির লোভ দেখাইয়াছে, বলিয়াছে এমন সুন্দর দৃশ্য অন্যত্র দেখিতে পাইবে না।

নাঃ, যাইতেই হইল দেখিতেছি। এতখানি লোভ সংবরণ করিবার কোন হেতু নাই। পাকাবাড়ীর ছাদে নিরাপদে বসিয়া পাহাড়, বনজঙ্গল দেখিবার লোভ সংবরণ করা সত্যই কঠিন। বিশেষ অরুণের প্রতি চিরকালই আমার একটা আকর্ষণের মতো ছিল—সেটাও অন্যতম কারণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়েও গভীরতর আকর্ষণ। অতএব বড়দিনের ছুটিতে যাওয়াই স্থির করিলাম এবং পত্রযোগে সে কথা অরুণকে জানাইয়া দিলাম।

যথা সময়ে রংপুর জেলায় উপস্থিত হইলাম, অরুণ গাড়ী লইয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিল। অরুণ বলিল—এসো, সোজা গাড়ীতে চড়া যাক—পাঁচ-ছয় মাইল পথ যেতে হবে।

কাঁচাপথে টমটম গাড়ী ছুটিতে লাগিল, এবারে দু'জনে কথাবার্তা বলিবার সুযোগ পাইলাম।

অরুণ বলিল—তুমি আসাতে কত যে খুশী হয়েছি বলতে পারিনে।

খুশী অবশ্যই সে হইয়াছে নতুবা কাঁচাপথে শেষরাত্রে স্টেশনে আসিত না।

সে বলিল—তোমার কি শরীর খারাপ? এত রোগা হ'য়ে গিয়েছ কেন?

বলিলাম, অনেকভাবে ওর উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু সবচেয়ে প্রাঞ্জল উত্তর এই যে, ইস্কুলমাষ্টারি করি।

সে হাসিল, বোধকরি মনের ব্যথাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই, বলিল, এযাত্রা ক'দিন থেকে যাও, তারপর মাঝে মাঝে এসো, শরীর সারবে।

অরুণের চেহারায় বড় পরিবর্তন ঘটে নাই, শুধু স্বাস্থ্যের রং লাগিয়াছে, বুঝিলাম স্বাস্থ্যের মূলে আছে সচ্ছলতা।

তারপরে চলিতে চলিতে অনেক কথা মনে হইল, প্রথমেই সে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার নামগুলি সংগ্রহ করিয়া লইল। সে এখনো বিবাহ করে নাই, আমি অনেকদিন কারয়াছি, ইস্কুলমাষ্টার বিবাহের চেয়ে গুরুতর আর কিই বা করিতে পারে।

দু'দিকে ধান-কাটা, শিশির-পড়া সবুজ মাঠ। অরুণের লিখিত পাহাড় দেখিবার আশায় এদিক-ওদিক চাহিলাম—।

অরুণ আমার ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল—ঐ দিকটায় গারো পাহাড়।

অন্য দিকের সহিত সেদিকের প্রভেদ বুঝলাম না, তবু বলিলাম—ওঃ, অর্থাৎ দেখিতে পাই আর না পাই—অতবড় সত্যটাকে অস্বীকার করি কি প্রকারে ?

ধরলা নদীর তীরে কচুয়া গ্রামে অরুণদের বাড়ী। ঘণ্টা দেড়-দুই সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছিলাম। আদর আপ্যায়নের অভাব হইল না যেহেতু অরুণ নিজে উপস্থিত, আবার বাড়াবাড়িও হইল না যেহেতু মা-মাসির দলের অভাব। অরুণ সংসারে একাকী, একদিকে এখনো বিবাহ করে নাই, অন্যদিকে পিতা-মাতা অনেকদিন গত হইয়াছে।

তাহার বাড়ীঘর ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে আগে যেমন কল্পনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহার চেয়ে অনেক ভালো, ইস্কুলমাষ্টারের কল্পনা তো, ভরসা করিয়া বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিকাল বেলা অরুণ বলিল—সুবোধ, তোমাকে এখানে রাখবার জন্যে আনিনি, কাল আমাদের রওনা হ'তে হবে।

অবশ্যই হইবে, তবু অত নির্বিকার হইলে চলে না, শুধাইলাম কোথায় ?

—সেই যে চা-বাগানের কথা লিখেছিলাম।

—ওঃ

—সেখানে পাহাড়, বন-জঙ্গল সমস্তই পাবে।

আরো কিছু পাবো তো ?—অর্থাৎ বাসস্থান আহার্য ইত্যাদি ! অরুণ যখন সঙ্গে থাকিবে ওসব চিন্তা ও অবশ্য করিয়াছে।

অরুণ বলিল,—এস্টেটের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী আছে, সাধারণতঃ চা-বাগানে যেমন বাড়ী হয়—মোটেই তেমন নয়।

কি বলা উচিত ভাবিতেছি।

অরুণ বলিল—ও বাগান আর বাড়ী দুই-ই ছিল এক সাহেবের। সে হঠাৎ, না, বিলেত চলে গেলে, আমরা সস্তায় সব কিনে নিয়েছি।

অরুণের সস্তা আর ইস্কুলমাষ্টারের সস্তা খুবসম্ভব কাছাকাছি নয়, তাই অঙ্কটার পরিমাণ আর জানিতে চাহিলাম না।

অরুণ বলিল—এখন ওখানে চমৎকার স্বাস্থ্য। আর নানা রকম বুনো পাখী পাওয়া যায়, কত খাবে? এর পরের বার তোমার ছেলে-মেয়েদের এনো।

এক একজন লোকের স্বভাব পরের ভালো করিতে পারলে আনন্দ পায়—অরুণ সেই জাতের।

—তবে কালই যাত্রা করা ঠিক? কি বলো?

আমি বলিলাম, আমি তো কল্‌কাতা থেকে যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি—আমার আবার কিসে আপত্তি?

পরদিন যাত্রার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে অরুণ প্রস্থান করিল।

অরুণ মিথ্যা বলে নাই, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যই অতুলনীয়। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের কেমন লাগিবে জানি না, কিন্তু বাংলা দেশের সমতল দৃশ্য-দেখা চোখের তৃষ্ণা আর মিটিতে চাহে না। অদূরে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সারি উঁচুনীচু হইয়া ধূসর দিগন্তের শেষসীমা পর্যন্ত প্রসারিত, আর ঐ পাহাড়ের পাদদেশ হইতে যেখানে দাঁড়াইয়া আছি উঁচু-নীচু শ্যামল মাঠ, নিকটেই একটা ছোট্ট পাহাড়ে নদী, এত ছোট যে, নামকরণের কষ্টস্বীকার কেহ করে নাই। এই মাঠের অনেকখানি জায়গা অরুণের চা-বাগান। এক সময়ে বাগান ছিল বটে, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ জঙ্গলা অবস্থায় পড়িয়া আছে। মাঝখানে একটি পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রাসাদ বলিলেও হয়, কেল্লা বলিলেও ক্ষতি নাই। এত বড় বাড়ী এখানে কে তৈয়ারী করিল, কেন তৈয়ারী করিল—অদ্ভুত!

বাড়ী যে-ই তৈয়ারী করুক তাহার শখ ও রুচি দুই-ই ছিল। সভ্যতার এই প্রান্তে নির্মিত বাড়ীটিতে আরামের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি ছিল না। ছিল না বলাই উচিত, কারণ এখন অনেকদিন অব্যবহৃত পড়িয়া থাকায় জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অরুণ বলিয়াছিল যে, কোন এক সাহেব চা-কর বাগানের মধ্যে বাড়ীটি তৈয়ারী করিয়াছিল—তার পরে সস্তায় বিক্রয় করিয়া দিয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছে।

অরুণ বলিল,—সুবোধ, আজ সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, তার উপরে আবার দু'জনেই পথের কষ্টে ক্লান্ত, আজ বিশ্রাম করা যাক,—কাল তোমাকে নিয়ে

বের হবো, ঐ পাহাড়টার কাছে যাবো—ওখানে একটা চমৎকার ঝরণা আছে।

আমি বলিলাম—সেই ভালো, আজ আর বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

রাত্রি আটটার মধ্যে আহার শেষ হইয়া গেল।

অরুণ বলিল—চলো, তোমাকে শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।

তেতলায় একটিমাত্র বৃহৎ কক্ষ—সেখানে আমার শোবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাদের বাকি অংশ খোলা, একদিকে একটি গম্বুজ—তার মধ্যে নীচতলা হইতে বরাবর একটা সিঁড়ি তেতলা পর্যন্ত উঠিয়াছে; অবশ্য বাড়ীর ভিতরের দিকেও আর একপ্রস্থ সিঁড়ি আছে।

তেতলার ঘরটি বেশ প্রশস্ত, ঘরের মধ্যে মূল্যবান মেহগনি কাঠের পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, আর টেবিলের উপরে মস্ত একখানি আয়না। টেবিলের উপরে দুইদিকে মোমবাতিদান। এই সমস্তই পুরানো আমলের অর্থাৎ বাড়ী যে তৈয়ারী করিয়াছিল—এগুলিও তাহারি আমদানী।

শীতের আটটা রাত্রিই অনেক, তারপরে পথশ্রমের ক্লান্তি; কাজেই অরুণ বিদায় হইবামাত্র মোমবাতি দু'টা নিভাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া লেপ টানিয়া লইলাম, নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। প্রথমেই লক্ষ্য হইল ঘরটা আলোকিত, ভাবিলাম আমি তো মোমবাতি নিভাইয়া শুইয়াছিলাম, আলো জ্বালিল কে? মনে হইল হয় তো কোন কারণে অরুণ ঘরে ঢুকিয়াছিল—সেই জ্বালিয়া থাকিবে।

মাথা ফিরাইয়া দেখিলাম দরজা বন্ধ না খোলা। বন্ধ বলিয়া মনে হইল। এবারে টেবিলের দিকে তাকাইতেই—ওকি! আয়নায় কার ছায়া? একি চোখের ভ্রান্তি না সবটাই স্বপ্ন? চোখের ভ্রান্তি হইতে পারে—কিন্তু স্বপ্ন নিশ্চয় নয়, আমি যে জাগ্রত তাহাতে সংশয় নাই।

ছায়ার পিছনে কায়া না থাকাও যে সম্ভব একথা তখন আমার মনে হয় নাই, মনে হইবার কারণও ছিল না, কাজেই ভাবিলাম এত রাত্রে এই অপরিচিত লোকটা আমাকে বিরক্ত করিতে ঘরে ঢুকিল কেন? কে এই লোকটা? পোষাক ও গায়ের রং দেখিয়া সাহেব বলিয়া মনে হইল, সুতরাং ইংরাজীতে শুধাইলাম—তুমি কে?

ছায়া কোন উত্তর দিল না, এমনকি আমার প্রশ্ন শুনিতে পাইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না, এমনি এক দুরাবস্থিত নির্লিপ্তভাব তাহার মুখে-চোখে। তাহার অবজ্ঞায় আমার বিষম রাগ হইল—তখন আমি উঠিয়া বসিয়া কায়াকে সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে ঘাড় ফিরাইলাম। কিন্তু কায়া কোথায়? লোকটা মুহূর্তে পলাইল নাকি? ঘুরিয়া দেখিলাম আয়নার ছায়াটি অবিচলভাবে বিদ্যমান! একি, কায়া নাই, ছায়া!

আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া আসিল, আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, শুইয়া পড়িলাম। কায়ার চেয়ে ছায়াকে যে মানুষের বেশী ভয়—এই প্রথম বুঝিলাম।

আমি যে সব ঘর ছাড়িয়া পালাইব, কিংবা অরুণকে ডাকিব—সে শক্তিও হারাইয়া ফেলিলাম। সেই শীতের রাত্রে শীতল ঘামে আমার শরীর ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল ছায়ার দিকে তাকাইব না—কিন্তু সাধ্য কি? ঐ ছায়ার দিকেই তাকাইতে বাধ্য হইতেছি—এরূপ ক্ষেত্রে ছায়াকে উপেক্ষা করিয়া অন্যদিকে তাকানো মোটেই সম্ভবপর নয়।

একবার চোখ ফিরাই, আবার তখনি আয়নার দিকে তাকাই, এক একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখি ছায়া আছে না মিলাইয়াছে।

আশ্চর্য! এছায়া কবারও আমার দিকে চাহিতেছে না, তাহার পক্ষে আমি যেন নাই। কেন জানি না, একটু একটু করিয়া সাহস ফিরিতেছিল, বোধকরি ভয়ের চরমসীমায় আসিয়া পৌছিলে স্বভাবের নিয়মেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বলিয়াই হইবে; বোধকরি অভ্যস্ত ভয় আর তেমন ভয়ঙ্কর মনে হয় না বলিয়াই হইবে; কিংবা ছায়ার মুখেচোখে এমন কিছু ছিল যাহাতে আমার বুদ্ধির অতীত সত্তা বুঝিয়াছিল যে, ভয়ের কারণ নাই।

সেই ছায়ার মুখে যে নৈরাশ্য ও বেদনার ছাপ—তেমন কোন জীবন্ত মানুষের মুখে কখনো দেখি নাই। ছায়াটি যেন আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া কত কি চিন্তায় মগ্ন!

এবারে দেখিলাম পকেট হইতে একখানা ক্ষুর বাহির করিল, এবং আমি বাধা দিবার পূর্বেই (ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, বাধা দিবার শক্তি আমার নাই) নিজের গলায় ক্ষুরখানা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। তাহার

মুখ পাণ্ডুর বিবর্ণ হইয়া গেল, শাদা সার্টের বক্ষদেশ রক্তে ভাসিয়া গেল এবং ছায়াদেহ মৃতদেহের মতো মাটিতে পড়িল।

এতক্ষণ আমি মুগ্ধবৎ সব দেখিতেছিলাম—হঠাৎ এবার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া, দরজা খুলিয়া একদৌড়ে বাহিরে ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখনো পূর্বদিকে উষার পূর্বাভাস জাগে নাই, কেবল ভোরের প্রথম ঝিঙাটি কুণ্ঠিত ডাক সুরু করিয়াছে। আমি সোজা অরুণের দোতলার শয়নকক্ষের বন্ধ দরজায় আসিয়া ধাক্কা মারিলাম—ওঠো, ওঠো।

চা-পানের পর অরুণকে বলিলাম—কি, বিশ্বাস হ'ল না বুঝি!

অরুণ বলিল—যা নিজেও দেখেছি তা বিশ্বাস না করবার হেতু নাই।

—তুমি দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—কেমন ক'রে?

—তুমি যেমন ক'রে দেখলে, ঐ ঘরে শুয়েছিলাম।

—তবে জেনে-শুনে আমাকে ওঘরে শুতে দিলে কেন?

—আমি ভেবেছিলাম যা দেখেছি তা মনের ছলনা মাত্র অর্থাৎ গল্পে যা শুনেছিলাম রাত্রে তাই দেখলাম, ভাবলাম সবটাই সাব্‌জেক্‌টিভ—

—ওঃ, তাই আমাকে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিলে?

—সত্য ভাবলে তোমাকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতাম না। ভেবেছিলাম সবটাই গল্প।

—কার কাছে শুনলে গল্প?

—সাহেবের চাপরাশির কাছে, সব ব্যাপার সে নিজে চোখে দেখেছিল?

—কোন সাহেবের চাপরাশি?

—যার এই বাড়ী ছিল।

—সবটা গুছিয়ে বলো শুনি।

অরুণ আরম্ভ করিল—বাড়ীটা ক'রেছিল মিঃ টমাস। চা-বাগানও ছিল তার। দূরে দূরে আরও অনেক চা-বাগানের মালিক ছিল সে। স্ত্রী ছাড়া আর তার কেউ ছিল না। একদিন কল্‌কাতা থেকে সাহেবের এক বন্ধু এসে হাজির হ'ল, মিঃ টমাস স্ত্রীর উপর তার আতিথ্যের ভার দিয়ে হঠাৎ দার্জিলিঙে চলে যেতে বাধ্য হ'ল। যেমন হঠাৎ যাওয়া

তেমনি ফেরাও হঠাৎ। এসে দেখল, আতিথ্যটা খুব ঘনিষ্ঠভাবেই চলছে। টমাসের রুদ্রমূর্তি দেখে বন্ধু তো তখনি পলাতক—স্ত্রী আর কোথায় পালাবে।

—তার পরে ?

—তার পরে সেই রাত্রেই টমাস তেতলায় ঐ গম্বুজের মধ্যে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

—হত্যা ?

—হ্যাঁ, গুলি ক'রে মারে, তারপর নিজেদের শয়নঘরে এসে, ওটাই শোবার ঘর ছিল, গলায় ক্ষুর বাধিয়ে আত্মহত্যা করে।

—এ সব দেখলো কে ?

—ঐ যে বললাম সাহেবের চাপরাশি। সে সব প্রত্যক্ষ দেখেছিল।

—এ কতদিনের আগের কথা ?

—প্রায় ত্রিশ বছর হবে।

—বাড়ী তো কিনেছ মাত্র বছর খানেক।

—হ্যাঁ, ঐ ঘটনার পর থেকে বাড়ীটা পড়েই ছিল, চা-বাগান করবার শখ হওয়ায় কিনেছি।

—সে চাপরাশিকে পেলে কোথায় ?

—সাহেব তাকে কিছু জমি কিনে দিয়েছিল—চার-পাঁচ মাইল দূরে একটি গ্রামে সে থাকতো।

—তার মানে এখন নেই ?

—না, অল্প কয়েকমাস আগে লোকটা মরেছে।

—তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কি ক'রে ?

—আমি বাড়ীটা কিনেছি শুনে দেখা করতে এসেছিল, তার কাছেই গল্পটা শুনেছিলাম।

—একে এখনও গল্প বলছ কেন ?

—হ্যাঁ, দু'জনের চোখে যখন যাচাই হ'য়ে গেল, তখন আর গল্প বলা উচিত নয়।

—তুমি কি দেখেছিলে ?

—তুমি যা কাল দেখেছ। তবে আগে গল্পটা শুনেছিলাম বলে বিশ্বাস করিনি! আর পাছে তুমি গল্প শুনে তার দ্বারা প্রভাবিত হও তাই আগে তোমাকে বলিনি।

দু'জনে চুপ করিয়া রহিলাম। অরুণ বলিল, শোবার ঘরে ঘটনার যেটুকু দেখলে তার পূর্বার্ধ—

—অর্থাৎ স্ত্রীকে হত্যা?

অরুণ বলিল,—হ্যাঁ, ঘটেছিল গম্বুজের মধ্যে; শুনেছি সেই নিদারুণ অংশটুকুরও ছায়াভিনয় চলে প্রতি রাত্রে ঐ গম্বুজের অন্ধকারে।

—কি ক'রে জানলে?

—আমাদের সরকার মশাই কি যেন দেখেছিলেন।

—কি?

—তা ঠিক তিনি বলতে পারলেন না, ছুটে পালিয়ে এসেছিলেন।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—যাব আজ রাত্রে? চেষ্টা করবে দেখতে?

আমি বলিলাম—চলো।

স্থির হইল দু'জনে আজ তেতলার ঘরে শয়ন করিব—এবং রাত্রি গভীর হইবামাত্র একটা টর্চবাতি সঙ্গে করিয়া গম্বুজে প্রবেশ করিব—

দেখা যাক্—আর কি ছায়ারহস্য প্রকাশ পায়।

দু'জনে সারাদিন শঙ্কাময় রহস্যের আবহাওয়ায় দণ্ডপল গুণিতে লাগিলাম —কখন সন্ধ্যা হয়, কখন রাত্রি হয়!

কিন্তু আমাদের আশঙ্কাময় আশা পূর্ণ হইল না। হঠাৎ বিকেলবেলায় কলিকাতা হইতে জরুরী তার পাইয়া আমাকে তখনি রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

অরুণ বলিল—চলো, আমিও যাই, এ বাড়ীতে আর একা নয়।

—এখন বুঝি বুঝছো যে, ওটা আর চোখের ছলনামাত্র নয়?

—ঠিক তাই।

সন্ধ্যার সময়ে দু'জনে স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। রাস্তা মোড় ফিরিবার আগে একবার বাড়ীটার দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম ছায়ারহস্যময় বাড়ীটা নিরেট এক ছায়ার মতো নীরবে দণ্ডায়মান। মানব জীবনের নিদারুণ একটা ট্র্যাজেডির সাক্ষী ঐ নীরব অট্টালিকা! প্রতি রাত্রে ওরই একান্তে ট্র্যাজেডির ছায়াভিনয় চলিতে থাকে। কেন, কি উদ্দেশ্য, কে বলিবে?

তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, সময় বিশেষে ছায়া কায়ার চেয়েও সত্যতর হইয়া উঠিতে পারে।

ফাঁসি-গাছ

আমাদের গ্রাম থেকে রেল স্টেশনে পৌছবার পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটি প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটি একটি বনস্পতি, যেমন বিশাল, তেমনি প্রাচীন; আর সেটা যে কি গাছ তার পরিচয় কেউ জানতো না। এদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে তার গোত্রের মিল ছিল না। চারদিকের বৃক্ষরাজির মধ্যে সেই বলিষ্ঠ, সমুন্নত, অজ্ঞাতকুলশীল বৃক্ষটি, পাণ্ডব-সৈন্যসমাবেশের মধ্যে যেন ঘটোৎকচ। স্বভাবতঃই বৃক্ষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো, কিন্তু তার আরও কারণ ছিল, সেটি ছিল একটি ফাঁসি-গাছ। লোকে বল্‌তো—নবাবী আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফাঁসি দেবার জন্য গাছটি ব্যবহৃত হ'ত। কাছেই একটি গ্রামে থাকতো নবাবের ফৌজদার; প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা ছিল তার; কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'লে জল্লাদে লোকটাকে ঝুলিয়ে দিতো গাছটির একটি ডালে। মানুষ ঝুলিয়ে দেবার মতো ডালগুলোই বটে। গাছটির গুঁড়ি থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাতের মধ্যে কোন ডালপালা নেই, একেবারে পরিষ্কার, গা মসৃণ তার উপরে ডাল বেরিয়েছে; এক-একটা ডাল কি লম্বা, একেবারে গ্রামান্তরে গিয়ে যেন পৌছয়, এমনি থাকে থাকে সুবিন্যস্ত ডাল উঠে গিয়েছে; যত উঁচুতে উঠেছে ততই ডালের দৈর্ঘ্য কম; সবসুদ্ধ মিলে গাছটি উপরের দিকে ছুঁচালো—মন্দিরের আকৃতি। গাঁয়ে গোপাল বলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান কৃষাণ ছিল, সে বল্‌তো তার ঠাকুর্দা নাকি ঐ গাছে ফাঁসি দিতে দেখেছে, সেটাই ছিল নাকি ঐ গাছে শেষ ফাঁসি-লটকানো। গোপালের বয়স তখন ছিল বিরানব্বই; গোপালের কথা সত্য হ'লে তার ঠাকুর্দার সময় নবাবী আমলের শেষে পড়ে বটে; আর তার মুখে এ গল্পটাও শুনেছি আমার বাল্যকালে, কাজেই গোপালের বিরানব্বই-এর সঙ্গে আমার বয়সের মোটা একটা অঙ্ক জুড়ে নেওয়া উচিত।

যাই হোক, শেষ ফাঁসির বর্ণনা সত্য হোক আর নাই হোক, গাছটা যে ফাঁসি-গাছ ছিল তা নিঃসন্দেহ। জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে ফৌজদার-

অধ্যুষিত ঐ গ্রামটির উল্লেখ আছে, আরও উল্লেখ আছে যে কাছাকাছির গাছগুলোতে ফাঁসি দেওয়া হ'ত। তা যদি হয় এমন যোগ্য গাছটির ব্যবহার না হবার কথা নয়।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস যাক। যা বলতে বসেছি তা হচ্ছে ঐ ইতিহাসের স্মৃতি। সেদিনের বিষাক্ত স্মৃতি আজও গাছটিকে ভয়াবহ ক'রে রেখেছিল। কেউ পারতপক্ষে রাতের বেলায় গাছটির কাছে যেতো না, একা তো নয়ই। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে, না গিয়েও উপায় ছিল না, রেল স্টেশনে যাবার সড়কের ঠিক পাশেই তার অবস্থান। কত নিঃসঙ্গ পথিক যে রাতের বেলায় ওখানে এসে দব্‌কে মূর্ছা গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের প্রশ্ন করলে বলতো—কি দেখলাম? তা কি এখন মনে আছে? তবে মনে হ'ল গাছের ডালে সারি সারি যেন মৃতদেহ ঝুলছে!

আবার কেউ বা বলতো মুমূর্ষুর অন্তিম আর্তনাদ স্পষ্ট শুনেছে। একজন বলেছিল, সে লোকটা বিদেশী—গাছের ইতিহাস জানতো না, ঐ গাছতলায় পৌঁছুবামাত্র হঠাৎ একটা মৃতদেহ ধপ্‌ ক'রে তার পায়ের কাছে পড়ল; সে চমকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে যে গাছের ডালে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। প্রশ্নের খোঁচা খেয়ে সে বলল যে, সেটা ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি, তার ভুল দেখবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে এসব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সত্য হ'তে পারে না, কেন না, ফাঁসি হ'ত বহুকাল আগে। তার সেদিনের স্মৃতি যদি কোন অলৌকিক সুড়ঙ্গ পথে আজ মূর্তি ধ'রে দেখা দেয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা, যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ-অপ্রমাণ করবার পথ বন্ধ।

কিন্তু যুক্তি এক আর বিশ্বাস আর। লোকের মনের ব্যাপক বিশ্বাসই এখন তথ্যের স্থান গ্রহণ করেছিল, আর তা-ই ছিল যথেষ্ট। ফলে ঐ গাছটা যাতায়াতের পথের পাশে ভীতিমিশ্রিত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

তারপরে বয়স বাড়লে কলকাতায় গেলাম কলেজে পড়তে। আমাদের মেসে একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকতেন, তাঁর থিওজফি চর্চার বাতিক ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসি-গাছটির বিবরণ শুনিয়ে ছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না ক'রে বল্‌লেন, এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, যেখানে কোন মর্মান্তিক মৃত্যু

ঘটে থাকে, সেখানে পরবর্তীকালে সেই মৃত্যুদৃশ্যের ঠিক পুনরভিনয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কেন এমন হয়, তিনি বললেন, তিনি জানেন না। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মৃত্যুর সময়ে মানুষগুলো যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিল, সেই নিদারুণ তাড়নাতেই ওখানে ঐ রকম অলৌকিক ছায়াছবি উদ্ভূত হ'য়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন।

বলা বাহুল্য এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হ'ল না, কিন্তু ও নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করিনি।

তারপরে কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম এবং চাকুরি উপলক্ষ্যে নিজের গ্রাম থেকে এক প্রকার নির্বাসিত হ'লাম। বহুকাল, জীবনের দুটি দশক কাটলো দেশে এবং দেশান্তরে। এই সময়ের মধ্যে স্বগ্রামে যাওয়ার সুবিধে হ'য়ে ওঠেনি। কালক্রমে গ্রামের ছবি মনে ঝাপসা হ'য়ে এল। রেল স্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে যে সব দৃশ্য, বাড়িঘর, গাছপালা, এমনকি মানুষের যে মুখগুলো যাতায়াতের পথের পাশে দেখতে পেতাম ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলাম, সেই সঙ্গে ফাঁসি-গাছটার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

প্রায় কুড়ি বছর পরে গ্রামে চলেছি। সন্ধ্যাবেলায় নামলাম স্টেশনে, একখানা টমটম গাড়ি ভাড়া করলাম, বারো মাইল পথ, পৌছতে এক প্রহর রাত হবে। পথে চল্‌তে চল্‌তে পুরাতন ছবিগুলো জন্মান্তরের স্মৃতির মতো একে একে মনে আসতে লাগলো, মনে হ'ল যেন ধীরে ধীরে নিজের অতীত কালের মধ্যে প্রবেশ করছি ; রাত তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছি, এমন সময়ে সেই ফাঁসি গাছটার কথা মনে পড়লো। ভয় হ'ল না, সঙ্গে তো গাড়ির গাড়োয়ান আছে, কৌতূহল হ'ল খুব। অভিনব কিছু দেখা যায় কিনা ভেবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ ক'রে নিয়ে স্থির হ'য়ে বসলাম। এবারে বোধ করি ফাঁসি-গাছের কাছে এসে পড়েছি, রাস্তার বাঁ দিকে গাছটা। ঐ তো গাছটা! কি বিরাট! অন্ধকারের আবছায়ার মধ্যে আরও বিরাট দেখাচ্ছে, সহস্র শাখা-প্রশাখায় অন্ধকারের আলখাল্লা প'রে যেন এক দৈবী অতিকায় পুরুষ। লোকে যে ভয় পাবে তা আর আশ্চর্য কি। আমারই সর্বাঙ্গ শির শির ক'রে উঠল। নির্বিপাকে গাছতলা অতিক্রম ক'রে গেলাম। কিছুদূরে এসে গাড়োয়ান বল্‌ল, বাবু, এখান দিয়ে আগে রাতের বেলায় যাওয়া বড় কঠিন ছিল।

—কেন?

—ফাঁসি-গাছটার ভয়ে।

কান খাড়া ক'রে সজাগ হ'য়ে উঠলাম, শুধোলাম···এখন বুঝি সাহস বেড়েছে?

—সাহস বাড়তে যাবে কেন? ভয়ের ব্যাপার তো আর নেই।

—গাছটার ভূত ছেড়ে গিয়েছে বুঝি?

—গাছটাই যে গিয়েছে।

—কোথায় যাবে?

—আপনি বুঝি এ পথে অনেকদিন আসেন নি! তাই জানেন না।

—কি ব্যাপার বলো তো!

সে আরম্ভ করলো—বছর পাঁচেক আগে একবার বৈশাখী ঝড়ের সময়ে গাছটার মাথায় বাজ পড়ে আগাগোড়া পুড়ে গেল। একটা বাজ যে অতবড় একটা গাছকে পুড়িয়ে আঙার ক'রে দিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

—তারপর?

—তারপরে সেই আঙার ঝড়ে-জলে ভেঙে পড়লো, ঝড়-ঝাপটায় কোথায় ছড়িয়ে গেল।

—এখন?

—এখন ও জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার—যেমন দেখলেন!

যেমন দেখলাম!

নিজের মনে মনে বল্‌লাম—আমি তো বাপু গোটা গাছটাকেই দেখেছি! অথচ তার কথাও বিশ্বাস না করা শক্ত। লোকটা মিথ্যা বলতে যাবে কেন? এ মিথ্যা ব'লে তার লাভ কি? এখুনি তো অপরের মুখে প্রতিবাদ হবে।

যেমন দেখলাম! কি দেখলাম? কিন্তু নিজের জাগ্রত দৃষ্টিকেই বা অবিশ্বাস করি কিভাবে? নিশ্চয় দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই। ভাবলাম একবার ফিরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা পথ এসেছে, তাছাড়া লোকটাই বা কি ভাববে?

তবে—কি দেখলাম? ছায়া না মায়া না কি! কিন্তু কিছু যে তা নিশ্চয়। তখন মেসের সেই থিওজফিস্ট ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। ভাবলাম গাছের ডালে মৃত্যুদৃশ্যের পুনরভিনয় যদি সম্ভব হয়, তবে মৃত গাছটির

পুনরভিনয়ই বা কেন অসম্ভব? তা-ই কি? আমার অভিজ্ঞতা কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু নিজে অবিশ্বাস করি কেমন ক'রে?

লোকটার কথা মনে পড়লো—'যেমন দেখলেন!' যেমন দেখলাম! কি দেখলাম মনের মধ্যে ক্রমাগত আলোড়ন করতে লাগলো, আর তার সঙ্গে তাল রেখে গাড়িখানা অন্ধকার পল্লীপথ দিয়ে এগিয়ে চলল—গ্রামের দিকে।

সিন্দুক

কলিকাতার সহস্র বিদ্যুতালোকের তলে বসিয়া মন নিশ্চিন্তে বলে যে, ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা কিছু থাকিতে পারে না; জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্রে বসিয়া বলা সম্ভব বটে যে, সংসারে অলৌকিক বলিয়া কিছু নাই, কেননা বিজ্ঞান সমস্ত ত্রিলোকের সীমা সরহদ্দ মাপিয়া-জুখিয়া পরীক্ষা করিয়াছে, কোথাও অলৌকিকত্ব পায় নাই। এ সবই সত্য স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, সংসারের সবটাই কলিকাতা নয়। এমন স্থানও আছে, যেখানে কি বিদ্যুতের আলো, কি বিজ্ঞানের আলো কিছুই প্রবেশ করে নাই। সেখানে মনের এমন নিশ্চিন্ত ভাব থাকে কি? দিনের বেলায় যাহারা ভূতে বিশ্বাস করে না, রাতের বেলাতে তাহারাই ভূতের কথা শুনিলে জড়ো-সড়ো হইয়া বসে। প্রভেদ ঘটায় ঐ আলোতে। সে আলো বিদ্যুতের হইতে পারে, আবার বিজ্ঞানেরও হইতে বাধা নাই। যাক্, ও-সব তত্ত্ব আলোচনা এক্ষেত্রে বাহুল্য। আজ আমি একটি ঘটনার বর্ণনা করিতে বসিয়াছি, কলিকাতার পাঠক কতখানি বিশ্বাস করিবে, জানি না। কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে যাঁহারা জড়িত, তাঁহারা সকলেই যে মূর্খ বা গ্রাম্য লোক এমন নহে। তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। বিশেষ, যাঁহার সঙ্গে এই ঘটনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী এবং বিজ্ঞান বিষয়েও কৃতবিদ্য। তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষদের অন্যতম। তাঁহার নামোল্লেখ করা উচিত হইবে না। কাজেই এই কাহিনীর মধ্যে তাঁহাকে র-বাবু বলিয়া উল্লেখ করিব।

র-বাবু আমার অনেককালের বন্ধু। একবার তিনি জানাইলেন যে, এবারে বড়দিনের বন্ধে আমাদের গ্রামে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার আছে।

—চলুন না, এ সময়ে দুধ-মাছ প্রচুর।

—তা ছাড়া আর কিছু আছে কি?

—আবার কি থাকা সম্ভব ?

—এই যেমন প্রাচীন ভগ্নাবশেষ।

—গ্রামে তো সবই প্রাচীন এবং তাহাও ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

—না, পরিহাস নয়। কাছাকাছি প্রাচীন গ্রাম নেই কি ? ভালো ক'রে ভেবে দেখুন।

তখন মনে পড়িল যে, আমাদের গ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে চাঁপাডাঙা নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। গ্রাম মানে কেবল নামটাই আছে, জনপ্রাণীও নেই, সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। প্রবাদ আছে যে, নবাবী আমলে চাঁপাডাঙায় নবাবের ফৌজদার থাকিতেন, তখন গ্রামটির বিপুল সমৃদ্ধি ছিল। তারপরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ফৌজদারী পদ লোপ পায়। কিন্তু গ্রামের সমৃদ্ধি তখনও ছিল। কিছুদিন পরে একবার মহামারীতে নাকি গ্রামের বারো আনা রকম লোক মারা যায়, বাকী সকলে উঠিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। সেই হইতে গ্রাম শ্মশান। শ্মশান বলিলে কম বলা হয়—সমস্ত অঞ্চলটি ছোটখাটো একটি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কেবল সেকালের স্মৃতি জাগাইয়া পড়িয়া আছে প্রকাণ্ড সব অট্টালিকা, একটির পরে আর-একটি, এমনি দু'তিন শত বিঘাব্যাপী। অধিকাংশ অট্টালিকাই এখন ধ্বংসস্তূপ, কোনটার প্রাচীর নাই, কোনটার ভিত্তি টলিয়া গিয়াছে, ছাদ বোধ করি কোনটারই নাই। সেখানে সাপ ও শিয়ালের অবাধ অধিকার। শীতকালে সাপ থাকে না, তবে মাঝে মাঝে গো-বাঘা বাহির হয় বলিয়া শুনিয়াছি। সেদিকে কাঠুরে ছাড়া তার কেহ যায় না, প্রয়োজন নাই বলিয়া যায় না, ভয়ের কারণ আছে বলিয়া যায় না। তবে কখনো কখনো গ্রামান্তরের বালক ও যুবকেরা চড়িভাতির জন্য গিয়া থাকে বটে, আমরাও কখনো কখনো গিয়াছি।

র-বাবুর কাছে চাঁপাডাঙার বর্ণনা করিলাম। ভাঙা বাড়ীর বিবরণ শুনিয়া মানুষের মুখ যে কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না, দেখিবার পরেও মাঝে মাঝে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

তিনি শুধাইলেন—আর কিছু আছে কি ?

—আর কি থাকবে ?

—এই যেমন শিলালিপি, কি মূর্তি ?

—মুসলমান ফৌজদারের গ্রামে মূর্তি কেমন ক'রে থাকা সম্ভব? তবে শিলালিপির সন্ধান তো কেউ করে নি, চলুন না, আপনি করবেন।

—বেশ তাই হবে। বড়দিনের ছুটির তো আর ক'দিন মাত্র বিলম্ব।

—ঠিক কথা, আর একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক আছে।

—ভিতরে কি আছে?

—কেমন ক'রে জানবো?

—কেন?

—কেউ খুলতে পারলে তো! আমরা একবার জন-দশেক মিলে চেষ্টা ক'রে দেখেছি ডালা তোলা যায় না!

—তালা বন্ধ?

—তালা বলে কিছু নেই। হয়তো ভারী বলেই তোলা যায় না, নয়তো ভিতর থেকে কোন কৌশলে আটকানো।

—খুব ইনটারেষ্টিং। ওটা খুলতে পারলে পুরানো কাগজপত্র পাওয়া যেতে পারে।

লোকে বলে, ওর মধ্যে থাকতো নবাবের খাজনার টাকা।

—অসম্ভব নয়।

—লোকের বিশ্বাস ওর মধ্যে বাদশাহী মোহর আছে।

—তার মানে পুরানো মোহর, র-বাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—পুরানো মোহর অত্যন্ত দামী জিনিস।

—নূতন মোহরটাই যেন খোলামকুচি—

—না-না, সে দামের কথা ভাবছি না, ওর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অসীম।

—চলুন, গিয়ে দেখা যাবে। কিন্তু একথা জানবেন যে, ও সিন্দুক খোলা মানুষের সাধ্য নয়।

—কেন?

—কেউ এ-পর্যন্ত খুলতে পারেনি, তা'ছাড়া ভয়ের কারণও নাকি আছে বলে শুনেছি।

এবার র-বাবু প্রত্নতাত্ত্বিক হাসি হাসিলেন, বলিলেন, পুরানো বাড়ীর সঙ্গে সর্বত্রই স্মৃতি জড়ানো, বিশেষ ভূতের ভয় করলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ অচল হ'য়ে দাঁড়ায়। তা' কত পুরানো জায়গাতেই তো ঘুরলাম, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানা, অলৌকিক-অপ্রাকৃত তো কিছু চোখে পড়ল না।

দু'দিন হইল র-বাবুকে লইয়া আমার গ্রামে আসিয়াছি। স্থির হইয়াছে যে, আগামীকাল বেলা দশটার মধ্যে আহার সারিয়া র-বাবু, আমি এবং গ্রামের আরও চার-পাঁচজন যুবক চাঁপাডাঙায় রওনা হইব। পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া যাতায়াত করা শীতের দিনে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। সন্ধ্যার মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিব।

পরদিন বেলা একটার মধ্যেই চাঁপাডাঙায় আসিয়া পৌঁছিলাম। অরণ্যের গভীরতা এবং ভগ্নস্তূপের প্রাচুর্য দেখিয়া র-বাবুর প্রত্নতাত্ত্বিক মন ভারী খুশী হইয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, এই যে আর একটা গৌড়। হাঁ, এমনটিই আশা করছিলাম।

তারপর তাঁহার পিছু পিছু আমরা চলিলাম। যেখানে বেশী ভাঙা, সেইখানেই তাঁহার বেশী আকর্ষণ। আস্ত দেয়াল দেখিবামাত্র সেদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন, আবার ভাঙা দেয়াল দেখিলেও সেই অবস্থা।

—র-বাবু একটু সরে দাঁড়ান, থামটা ধসে পড়তে পারে!

—দাঁড়ান একটা ছবি তোলবার চেষ্টা করি। র-বাবু ক্যামেরা বাগাইয়া ধরিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের অপরিহার্য সঙ্গী ক্যামেরা।

কখনো বা একটা ভগ্ন থামের কাছে আর একটা ভগ্নপ্রায় থামের মতো নিশ্চল হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। কি দেখিতে পান, তিনিই জানেন।

মোট কথা, তাঁহার সঙ্গে ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে, পারতপক্ষে কেহ যেন প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে না বাহির হয়।

এবারে তিনি বলিলেন—চলুন, সিন্দুকটা দেখে আসি।

যে অট্টালিকার মধ্যে সিন্দুকটা আছে, লোকে তাহাকে সিন্দুক-বাড়ী বলে। তাহার দরজা-জানালা কিছুই নাই, তবে ছাদটা আছে, সেইজন্য ভিতরটা কেমন অন্ধকার-অন্ধকার।

সিন্দুকটা দেখিয়া র-বাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন—এ যে একটা ছোটখাটো ঘর, মশাই।

—তা বই কি। ওর মাপ-জোখ আমাদের জানা আছে। পাঁচ ফুট খাড়াই, আর লম্বেপ্রস্থে দশ ফুট ও আট ফুট।

—হবেই তো। সেকালে তো কারেন্সী নোট ছিল না, খাজনার টাকা রাখবার জন্য প্রকাণ্ড সিন্দুকের দরকার হ'ত। কিন্তু কই, তালাচাবি তো দেখি না!

আমি বলিলাম—হয়তো এককালে ছিল।

—কিন্তু খুলতো কি উপায়ে?

আমি বলিলাম—হয়তো খুলবার কিছু কৌশল ছিল; নইলে শুধু গায়ের জোরে খোলা অসম্ভব।

—বাপ, এর ডালাটারই তো ওজন বোধ করি পঞ্চাশ মণ হবে, বলিলেন র-বাবু।

—হবেই তো।

—সংখ্যায় আমরা বেশী হ'লে একবার চেষ্টা ক'রে না-হয় দেখতাম।

—আমরা বিশজনে চেষ্টা ক'রে দেখেছি।

আর একজন সঙ্গী বলিল—সেবার আমরা শিকারে এসেছিলাম। ফিরবার পথে সকলে মিলে চেষ্টা করলাম, সংখ্যায় জন-ত্রিশেকের কম ছিলাম না।

এমন সময়ে একদল চামচিকা ফরফর শব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল এবং একটা ভীত শিয়াল পাশ দিয়া ছুটিয়া পালাইল।

আমি বলিলাম—চলুন, বাইরে যাওয়া যাক্, ভিতরটায় কেমন ভাপসা গন্ধ, আর কেমন একরকম ছম্‌ছমে অন্ধকার।

আর একজন সঙ্গী বলিল—হাঁ, এবার কোথাও বসে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

সঙ্গে ফ্লাস্কে চা ও টিফিন ক্যারিয়ারে খাদ্য ছিল।

সকলে বাহির হইলাম এবং বসিবার মতো পরিচ্ছন্ন স্থান সন্ধান করিতে লাগিলাম। মনোমত স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে মিনিট দশেক সময় লাগিল, যখন সেখানে গিয়া পৌছিলাম, দেখি যে র-বাবু নাই! কোথায় গেলেন? দু'চার মিনিট অপেক্ষা করিয়া নাম ধরিয়া ডাকাডাকি সুরু করিলাম! যে ঘন জঙ্গল, দলচ্যুত হওয়া বা পথ হারানো মোটেই অসম্ভব নয়।

যখন অনেক ডাকাডাকির পরেও উত্তর পাইলাম না, তখন চারিজন চারদিকে বাহির হইলাম। এ তো বিষম মুশকিল হইল দেখিতেছি।

কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে সমস্ত অঞ্চলটা প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি আর্তকণ্ঠ শোনা গেল।

চারজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, এ যে র-বাবুর স্বর!

—কোন্ দিক থেকে আসছে?

—চলো, সিন্দুক-বাড়ীর দিকে দেখা যাক।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কৌতূহলের অবসান হইল।

সিন্দুক-বাড়ীতে ঢুকিতেই দেখিতে পাইলাম, সিন্দুকের কাছে র-বাবুর সংজ্ঞাহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত। আর কিয়দ্দুরে তাঁহার ক্যামেরা পড়িয়া আছে।

—কি ক'রে হ'ল?

—কেন হ'ল?

—ভয় পেয়েছেন?

—না, না, ক্লান্তি। কলকাতার লোক, বেশী, হাঁটার তো অভ্যাস নেই!

আমি বলিলাম—আগে বাইরে নিয়ে চলো, তারপরে অন্য কথা।

চারজনে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া মাঠের মধ্যে শোয়াইয়া দিলাম এবং একজন মাথায় বাতাস দিতে লাগিল। আমি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলাম—না নাড়ীর গতি ঠিক আছে, ভয় নেই।

—কিন্তু ওঁর গায়ের কাপড়টা গেল কোথায়?

—দেখো তো অজয়, বোধ হয় সিন্দুকের কাছেই কোথাও পড়ে আছে।

এক মুহূর্ত পরে অজয় ছুটিয়া বাহিরে আসিল, মুখ তাহার শাদা।

—কি ব্যাপার! গায়ের কাপড় কই?

অস্ফুটকণ্ঠে অজয় বলিল—আপনারা কেউ যান।

—সে আবার কি?

আমি অগ্রসর হইতে যাইব, সে জামা ধরিয়া টানিল,—একা যাবেন না।

—বেশ তো, তুমিই এসো না।

এতক্ষণ পরে সাহস পাইয়া কিংবা কৌতূহলের তাড়নায় সে আমার পিছু পিছু আসিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখি গায়ের কাপড়খানা মাটিতে লুটাইতেছে। আমি শুধাইলাম, হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

সে কোন কথা না বলিয়া ইঙ্গিত করিল, দেখিয়া মুহূর্তের জন্য আমার গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া গেল, দেখিলাম, গায়ের কাপড়ের একপ্রান্ত সিন্দুকের ডালা-চাপা!

দু'জনে তখনি বাহির হইয়া আসিলাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরে একখানা গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া র-বাবুর অর্ধ সংজ্ঞাহীন দেহ তাহাতে চাপাইয়া দিয়া রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত সময়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, ভয়ের কারণ নাই, কোন কারণে অকস্মাৎ নার্ভাস শক পাইয়াছেন। অপ্রীতিকর আলোচনা উঠিতে পারে, এমন কোন প্রসঙ্গ তুলিতে নিষেধ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। সামান্য গরম দুধ মাত্র পান করিয়া র-বাবু তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে পড়িয়া রহিলেন।

পাশের ঘরে আমরা পরস্পরকে শুধাইতে লাগিলাম, গায়ের কাপড় সিন্দুকের ডালা চাপা পড়িল কি-রকম ভাবে?

—ও ডালা পঞ্চাশজন লোকে ঠেলে তুলতে পারে না।

—আর খুব সম্ভব ভিতর থেকে বন্ধ!

—তবে কি!

র-বাবুর মূর্ছা আর আমাদের কাছে বিস্ময়জনক নয়, আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম মূর্ছার কারণ ঐ অসম্ভব ব্যাপারের মধ্যে নিহিত। কিন্তু সেটা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল? হয়তো র-বাবু বলিতে পারেন, কিন্তু ও-সব প্রসঙ্গ তুলিতে ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ।

এই ঘটনার পরে র-বাবু আমাদের গ্রামে মাত্র আর তিনদিন ছিলেন। সকলেই বলিল—আর নয়, একটু সুস্থ হইবামাত্র ঘরের ছেলেকে ভালোয় ভালোয় ঘরে পাঠাইয়া দাও। যে কয়দিন তিনি ছিলেন, একদম কথাবার্তা বলিতেন না, এমন কি পাশে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিলেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। অতএব তাঁহার দ্বারাও যে রহস্যভেদ হইবে, সে আশা বড় রহিল না এবং সত্য সত্যই আমাদের সম্মিলিত কৌতূহলকে অপরিতৃপ্ত রাখিয়া তিনদিন পরে তিনি কলিকাতয় চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে র-বাবুর চিঠি পাইলাম, তিনি লিখিতেছেন—

'এতদিনে সুস্থ হ'য়ে উঠেছি এবং বোধ হয় ধীরভাবে চিন্তা করবার শক্তিও ফিরে পেয়েছি, কাজেই ভাবছি যে আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যা লিখবো তাতে আপনাদের কৌতূহল শান্ত হবে কিনা সন্দেহ, কেননা সেদিন যা ঘটেছিল আমি আজও তার পূর্বাপর খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল লিখছি।

আপনাদের সঙ্গে সিন্দুক-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেই মনে হ'ল যে সিন্দুকটা একটা ছবি তুলে নিলে হ'ত। আপনারা তখন খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন, তাই আপনাদের আর ডাকলাম না, ভাবলাম ছবি তোলা ছু' মিনিটের ব্যাপার।

আবার সিন্দুক-বাড়ীতে ঢুকলাম। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে দেখি যে সম্ভব নয়। একে তো ভিতরটা অন্ধকার তারপরে আবার বেলা পড়ে এসেছে, ছু'চার মিনিট চেষ্টা ক'রে যখন বুঝলাম যে অসম্ভব তখন বের হবার জন্য মুখ ফেরালাম। এমন সময়ে অনুভব করলাম আমার গায়ের কাপড়খানা ধরে কে যেন টানছে, ফিরে দেখি, সিন্দুকের ডালা একটু ফাঁক হয়েছে, আর ভাবলে এখনো সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে, তার মধ্যে থেকে একখানা হাতের কিয়দংশ, সে হাতে রক্তমাংস নেই, ধূমল চর্ম দিয়ে শুধু হাড় ক'খানা ঢাকা, সেই হাত আমার চাদর ধরেছে। এক মুহূর্তের জন্য আমার শরীরের রক্ত জমে গিয়ে আমি যেন পাষাণ হ'য়ে গেলাম, তার পরেই মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেলাম। পড়বার সময়ে খুব চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম, সেই চীৎকার শুনেই আপনারা এসে থাকবেন।

আর কিছুই মনে নেই, তবে এ নিশ্চয় বলতে পারি, অত বড় ভারী ডালাটা যে ফাঁক হ'ল, এতটুকু শব্দ হয়নি, আর এটাও অর্ধচৈতন্য অবস্থায় মনে আছে যে, ডালাটা নেমে যাবার সময়েও এতটুকু শব্দ করেনি। ঐ এক মুহূর্তের মধ্যেই সিন্দুকটার ভিতরেও বোধ করি আমার দৃষ্টি একবার পড়ে থাকবে, নইলে এ স্মৃতি কোত্থেকে এল, ভিতরে যে পুঞ্জিত ধোঁয়ায় গঠিত বিরাট একটা দেহ সিন্দুকটার সমস্তটা পূর্ণ ক'রে রয়েছে। আর কিছু মনে নেই। তা ছাড়া ঐ স্মৃতিটাই বিষাক্ত বলে মনে হচ্ছে, ওটাকে সযত্নে চাপা দিয়ে রাখছি। যেটুকু নেহাত না লিখলে নয়, আপনারা নিশ্চয়ই জানবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে আছেন, তাই লিখলাম। এ বিষয়ে আর কোন প্রকার আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার নেই।'

র-বাবুর চিঠিতে রহস্যভেদ না হইয়া রহস্য ঘনতর হইয়া উঠিল মাত্র।

ইহার পরে আর অল্পই বলিবার আছে। র-বাবু চলিয়া আসিবার পরে একদিন আমরা আট-দশজনে মিলিয়া চাঁপাডাঙায় গিয়াছিলাম গায়ের কাপড়খানার কি হইল জানিবার উদ্দেশ্যে। সিন্দুকের কাছে গিয়া দেখি

গায়ের কাপড়খানার চিহ্নমাত্র নাই। তখনি আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। সকলেই মনে মনে বুঝিলাম, যদিচ মুখে কেহ কিছু প্রকাশ করিলাম না যে কাপড়খানা সিন্দুকের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে, অন্য কোন প্রকারে তাহার লোপ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কপালকুণ্ডলার দেশে

বিচিত্র কর্মপ্রবাহ আমাকে কপালকুণ্ডলার দেশে টানিয়া আনিয়াছে। নবকুমারের মতো আমি রসুলপুরের নদীর মোহানা বাহিয়া আসি নাই বটে, তবে রসুলপুরের নদীর মোহনার ধারেই আসিয়া পড়িয়াছি। কয়েকশত বৎসর আগে এই অঞ্চলকে নবকুমার যেমন দেখিয়াছিল বা আশি বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন দেখিয়াছিলেন, আমিও তেমনি দেখিলাম। কপাল-কুণ্ডলার দেশে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আরও ভালো করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে একটা বালিয়াড়ির শিখরে চড়িলাম। অদূরে রসুলপুরের নদীটা দুই তটবাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। এই নদী সমুদ্রের আলিঙ্গনে, কোথায় নদীর শেষ, আর কোথায় নদীর আরম্ভ বুঝিতে পারা যায় না। পারা গেলে কি মিলন অসম্পূর্ণ থাকিত না? যে মিলনে দুইয়ের সীমা ঘুচিয়া না যায় সে তো জোড়া লাগামাত্র, মিলন নয়। এতদূর হইতে সমুদ্রের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তার বেশী নয়। একটা কূলে আমি দাঁড়াইয়া আছি—আর একটা কূল নাই, কেবল সীমাহীন প্রসার—অভ্যস্ত চোখ না হইলে তাহাকে আকাশ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া চিনিতে পারিবে না। দূরে, ঐ সীমাহীনের মাঝখানে একটা জায়গায় একটা রেখা মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। ওই বোধহয় তরঙ্গমালা। দূরত্ব এমন অপরিমিত যে তরঙ্গমালার গতি বুঝিবার উপায় নাই—মনে হয় তরঙ্গরেখা একই স্থানে কুঞ্চিত হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। চোখ দুটার দৃষ্টিকে পীড়ন করিয়া সমুদ্রে ইউরোপীয় জাতির অর্ণবপোত আবিষ্কারের চেষ্টা করিলাম—কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নাঃ, নবকুমারের সময়ের পরে অনেক যুগ চলিয়া গিয়াছে—অর্ণবপোত এখন স্বল্পজলে আসিবে না। নদীর কূল হইতে আমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছি—অনেকটা জায়গা, কিন্তু না আছে সেখানে ধানের ক্ষেত বা ক্ষেতের চিহ্ন, আবার না আছে বড় গাছগাছড়া, কেবল ইতস্ততঃ ছোটখাটো ঝোপঝাড়। বুঝিতে কষ্ট হয় না যে বর্ষাকালে সমস্তটা ভরিয়া যায়,

গুল্মগুলি ডুবিয়া নষ্ট হয়, জল সরিয়া গেলে আবার জন্মায়। ওদের জীবন ষান্মাসিক। আমি একটি বালিয়াড়ির চূড়ায় দাঁড়াইয়া আছি—আমার বামে বালিয়াড়ির উঁচুনীচু শৃঙ্খল অনাদ্যন্ত প্রবাহে চলিয়াছে—শুনিতে পাই সুবর্ণরেখা অবধি এমনি চলিয়াছে। আমি যেটির উপরে আছি সেটা এই গিরিশৃঙ্খলের শেষ চূড়া—তার পরেই নদী উপত্যকার সমতল মাঠ। ১৯৪২-এর প্রবল বন্যা ও ঝড়ে বালিয়াড়ির উচ্চতা অনেকটা নাকি হ্রাস পাইয়াছে, আবার অনেকগুলি একেবারেই নাকি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আমার পিছনে, বালিয়াড়ির নীচেই উদ্ভিদ্ জগতের সীমানা। গাছের মধ্যে প্রধান একরকম বন্য বাদাম আর ঝাউ গাছ। বোধ করি নবকুমার ক্ষুন্নিবৃত্তির আশায় এই বুনো ফলগুলিও খাইয়াছিল। নবকুমারের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলো বুনো বাদাম পাড়িয়া আনিলাম। ফলগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম কলিকাতার সৌখিন কফি হাউসে ভর্জিত আকারে লোকেরা এগুলি খায়। কিন্তু আবার আমার দুর্ভাগ্য। এখনো পাকে নাই। নবকুমার পৌষের শেষে খাইয়াছিল—এখন চৈত্র মাস। পাকিতে আরও কিছু বিলম্ব। বুঝিলাম পাকা লেখকের হাতে পড়িলে ফল অকালে পাকিয়া ওঠে।

ঝাউয়ের শাখায় অবিরল হাহাকার চলিতেছে। এখানে সমুদ্রের আর কিছু না থাক সমুদ্রের হাওয়াটি আছে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই তালে তালে দমকে দমকে তার গতি—ঝাউয়ের শাখা করুণায় শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে। ওই সমুদ্র যেন গৃহহারা কোন্ গুণী—মানব জগতের প্রান্তে মাটির উপরে দেহ এলাইয়া দিয়া ঝাউএর বাঁশীটি অধরে তুলিয়া লইয়াছে। অনাদি ব্যথার অনন্ত সুর ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ঝাউয়ের হাহাকারে এমন করিয়া মন উদাস করিয়া দেয় কেন? তার কারণ কিছুই নয়—ঝাউগাছ যেখানেই হোক তার আদি জন্মভূমি সমুদ্রতীরের স্মৃতি ভুলিতে পারে না। সমুদ্রতীরের স্মৃতিতে তার মনে আদিকালের বিরহ ব্যথা ধ্বনিত হইয়া ওঠে। সেই বিরহ শ্রোতার মনে চৈতন্যপূর্ব বেদনা জাগ্রত করিয়া দেয়—সে হাহাকার করিয়া ওঠে, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারে না। তাই তার এমন উদ্‌ভ্রান্তি।

সন্ধ্যার ছায়া নামিতেছে। আকাশ এখনো সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আচ্ছন্ন, কেমন যেন ঘোলাটে, কেবল পশ্চিমের সূর্যাস্তের স্থানটা রক্তাভ। বাতাস

শীতল হইয়া উঠিতেছে—প্রকৃতির দৃশ্যপথের উপরে কে যেন কোমল তুলি বুলাইয়া দিয়াছে। ভাবিলাম সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইবার আগেই ফিরিতে হইবে, নতুবা নবকুমারের আশঙ্কা অপ্রত্যাশিতভাবে সফল হইয়া "শিয়ালের" আবির্ভাব হইতে কতক্ষণ। এই বাঘের রাজ্যে নবকুমার শিয়ালের হাতে না পড়িয়া কপালকুণ্ডলার হাতে পড়িয়াছিল—আমার যেমন কপাল আমার ভাগ্যে শৃগালোদয় ঘটিয়া যাইবে। আবার কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াও বিচিত্র নয়। কাজেই মোটরখানার কাছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরিয়া গেলাম এবং গাড়ীতে উঠিয়া চাবি টিপিলাম। গাড়ীখানা বার দুই গোঁ গোঁ শব্দ করিল—কিন্তু চলিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। তখন গাড়ী হইতে নামিয়া হাতল ঘুরাইতে আরম্ভ করিলাম। হাতল ঘুরিল, হাত ব্যথা হইল—কিন্তু গাড়ী কিছুতেই চলিল না। সর্বনাশ! গাড়ীটা কিছুক্ষণ ঠেলিতে পারিলে চলিতে পারে—কিন্তু লোক কোথায়? মাঠের মধ্যে কোথাও জন-প্রাণী নাই। এখন? এ যে সত্য সত্যই নবকুমারের দশার সূচনা। এদিকে অন্ধকারের প্রথম পর্দাখানা মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম এখন গাড়ীর চিন্তা রাখিয়া বাড়ীর চিন্তা করিবার সময়। নিকটে কোথাও লোকালয় থাকিলে সেখানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে—গাড়ী এখানেই পড়িয়া থাক। "শিয়ালে" গাড়ীর আর কি করিবে? লোকালয়ের সন্ধানে বাহির হইলাম। বালির উচ্চ একটা শিরদাঁড়ার উপর দিয়া পথ—একটা বালিয়াড়ির অংশ—বোধ হয় কোন প্রাচীনকালে একটা নদীস্রোত ভূমিকম্পের ঠেলায় উঁচু হইয়া শুকাইয়া গিয়াছিল—এখন তার চিহ্নরূপে শুষ্ক বালির নিশানা পড়িয়া আছে। বালুকাময় পথের একদিকে বাদাম, ঝাউ আর আম কাঁঠালের বন—আর এক দিকে ধু ধু মাঠ—সমুদ্রের প্রান্তে গিয়া মিশিয়াছে।

চলিতে লাগিলাম—পথ উঁচুনীচু, নির্জন, মাথার উপরে ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাস, চারিদিকে হাওয়ার হাহাকার—অন্ধকার ক্রমে ঘনতর হইতেছে। এমন সময়ে একটা বালিয়াড়ির আড়াল হইতে আলুলায়িতকুন্তলা, হরিণনয়না কোন তরুণীর মূর্তি যদি জাগিয়া ওঠে, আর সে বারেক আমার দিকে তাকাইয়া যদি বলিয়া ওঠে, পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ, তবে মন্দ হয় না। কিন্তু নাঃ, এসব কাণ্ড কেবল কাব্যে উপন্যাসেই ঘটে। আমি তো সমুদ্রতটে বালিয়াড়িতে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইলাম না। কেহ

কখনো শিবমন্দিরে তিলোত্তমার দর্শন পাইয়াছে কি? তবে সংসারে কৎলুখাঁ ও বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রচুর। তাহাদের সাক্ষাৎ যাজ্ঞা না করিলেও ঘটিয়া যায়। সর্বনাশ! যদি কাপালিকটাই দেখা দেয়। দ্রুততর চলিতে লাগিলাম। আচ্ছা, আমি না হয় কল্পনা লেশহীন নিরেট গদ্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহার চর্ম-চক্ষুতেও কপালকুণ্ডলা তো পড়েন নাই। তবে তিনি নাকি কাপালিকের দেখা পাইয়াছিলেন। একটা রাত্রি নাকি তাঁহাকে এই অঞ্চলেই কাটাইতে হইয়াছিল। তাহারই প্রত্যক্ষ ফল নাকি কপালকুণ্ডলা কাব্য।

হাতে একটা টর্চ-বাতি ছিল, এখন সেটা ঘন ঘন টিপিয়া পথ চলিতে হইতেছে। একবার টর্চের বিদ্যুৎ আলোয় পথের বাঁদিকে একটা উঁচু ভিটার মতো চোখে পড়িল। কাছে গিয়া দেখিলাম—একটা চারচালা ঘরই বটে। কিন্তু ঘরটা তাহার চতুর্থ অবস্থায় আসিয়া পৌছাইয়াছে। চারিদিকে ঘুরিয়া বুঝিলাম—এককালে গৃহটি সুনির্মিত ছিল। মেঝে এখনো পাকা, তবে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকায় ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে। দরজা জানালা খসিয়া পড়ার মতো—কাছেই আর দুটি ভিটা—সেখানে ভূতপূর্ব ঘরের চিহ্ন মাত্রও নাই। ভাবিলাম এই নির্জনে ঘরগুলি আসিল কোথা হইতে? ভাবে মনে হইল—ডাকবাংলা জাতীয় কোন আশ্রয় হইবে। খুব সম্ভব বেয়াল্লিশের বন্যায় এমন দুর্দশা হইয়াছে। তারপরে মেরামতের কথা আর কাহারো মনে পড়ে নাই।

ঘরটির ভিতরে ঢুকিলাম। একখানা জীর্ণ খাটের কঙ্কাল ছাড়া আর কোন আসবাব নাই। ভাবিলাম এখানেই রাতটা কাটাইয়া দেওয়া যাক। চোর ডাকাত আসিবে না, তাহারা যতই চতুর হোক এখানে জনাগম কল্পনা করিতে পারিবে না। আর "শিয়াল!" দরজার দিকে তাকাইলাম। কোনরূপে ভেজানো চলে মাত্র—অর্গল বলিয়া কিছুই নাই। শিয়াল কখনো ঘরে ঢুকিয়া লোক ধরে না বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম। কাজেই দরজা ভেজাইয়া দিয়া শূন্য চৌকির উপর শুইয়া পড়িলাম। একটু নড়িলেই খাটের কঙ্কাল মড় মড় করিয়া আপত্তি জানায়। ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না। একবার মনে হইল—হয়তো এই ঘরটিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনেককাল পূর্বে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। মনে মনে হাসি পাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সাহিত্য-সিংহাসনে বসিবার সুযোগ পাইলাম

না—কিন্তু তাঁহার শূন্য খট্বার আজ আমি একমাত্র উত্তরাধিকারী, অন্ততঃ একটা রাত্রির জন্য। আর কেহ তাহাতে ভাগ বসাইতে আসিবে না আশা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, খাটখানা মড় মড় শব্দ করিয়া উঠিল। অপরিচিত স্থানে সুনিদ্রা হয় না। ঘুম ভাঙিয়া প্রথমে ঠাহর হইল না কোথায় আছি। বিদ্যুতের বাতি টিপিয়া চারিদিক দেখিয়া সম্যক্ অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। তাই তো! জনশূন্য মাঠের মধ্যে ভাঙা একখানা ঘরে একাকী পড়িয়া আছি। দরজা ভেজাইয়া দিয়াছিলাম, খুলিয়া গিয়াছে। যে-বাতাস! বাতাস যেন ঝড়ের বেগ ও গর্জন পাইয়াছে—ঝাউয়ের শাখায় শাখায় কি পাগলামি চলিতেছে! আর বাতাসের উত্তাল উন্মত্ততার পটভূমিতে আরও একটা দূরশ্রুত চাপা হুঙ্কারের মতো কি যেন ধ্বনি! দিনের বেলায় তো শুনি নাই। একটু স্থির হইয়া ভাবিতেই মনে হইল—খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রের গর্জন। ঠিক, তাহা ছাড়া আর কি হইবে? শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। পশ্চিম দিগন্তে ম্লান চন্দ্র অস্ত যাইবার আয়োজন করিতেছে। সেই আবছায়া আলো-অন্ধকারে সমস্ত দৃশ্যপট কালি-ঢালিয়া পড়া একখানা ছবির মতো অস্পষ্ট। বাতাসের গর্জন, ঝাউয়ের শাখার মাতামাতি, দূরশ্রুত সেই বিরামহীন ভৈরবধ্বনি। সমস্ত প্রকৃতি যেন এক ভৈরবীচক্রে অবাঞ্ছিতের মতো উপস্থিত। অননুভূতপূর্ব একভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে কি ভয়? ভয়ের মূলে এক নির্দিষ্ট আশঙ্কা থাকে—কিন্তু এই নূতন অনুভূতির মূলে তেমন কোন নির্দিষ্ট ভাব নাই। জনপদবাসী মানুষ জনপদের বাহিরে আসিয়া পড়িলে বোধ করি এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। ঘড়িতে মাত্র বারোটা। জাগিয়া থাকা নিরর্থক মনে করিয়া আবার আসিয়া শুইলাম। বার-দুই এপাশ ওপাশ করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ যেন মনে হইল কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! চোর ডাকাত নাকি? এখানে আসিতে যাইবে কেন? ভাবিলাম একবার লোকটার চেহারা দেখিতে পাইলে হইত, কিন্তু উঠিতে সাহস করিলাম না, নিদ্রিতের মতো পড়িয়া রহিলাম। দরজার ফাঁক দিয়া একটুখানি আবছা আলো ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। অস্তমান চাঁদের আলো নাকি? কিন্তু চাঁদটা নিশ্চয় ডুবিয়া গিয়াছে। আমি তো অনেকটা সময় ঘুমাইয়াছি।

লোকটা ঘরের মধ্যে কি যেন সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। একবার সে দরজার অবকাশ ও আমার দৃষ্টির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। না দেখিয়া পারিলাম না—কিন্তু না দেখিলেই বুঝি ভালো ছিল। দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, দৃঢ়-শরীর, মাথায় জটা! আবার সে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। পাশ ফিরিলে দেখা যায় কিন্তু নড়িতে সাহস হইল না। কিন্তু ভূত না মানুষ? যেই হোক এখানে কেন? কি খুঁজিতেছে! ভূত বা মানুষ যে-ই হোক আমাকে তো দেখিতে পাইবার কথা! ও কি দেখিতে পায় নাই? না, দেখিয়াও গ্রাহ্য করিতেছে না? কিংবা সবই হয়তো মিথ্যা—আমি তো স্বপ্ন দেখিতেছি না? চোখে হাত দিয়া দেখিলাম চোখ খোলা, চিমটি কাটিয়া দেখিলাম বেদনা বোধ হইতেছে। তবে লোকটা বাস্তব। কিন্তু ও কে? এবং এখানে কেন? শুধাইব? সর্বনাশ! নড়িবার সাহস অবধি নাই।

এবারে লোকটা বৃথা সন্ধান ছাড়িয়া দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং কথা বলিল—আমি সে কথা শুনিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম বলিতেছি কিন্তু সে যেন কানে শোনা নয়; তাহার কথাগুলি যেন উপলব্ধি হইতে লাগিল। লোকটা বলিতেছিল—নাঃ, লোকটাকে কি বলিলাম আর কি লিখিল। আমি বলিলাম আমার সাধনামার্গের গূঢ় রহস্য—লিখিয়া বসিল একটা গল্প!

এবারে বুঝিলাম হয় আমি স্বপ্ন দেখিতেছি নয় লোকটা ভূত। কারণ একমাত্র স্বপ্নের কথাই কানে না শুনিয়াও বুঝিতে পারা যায়—আর কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম—যে সাধারণতঃ মানুষ যেমন ভূতকে দেখিতে পায় না, ভূতের পক্ষেও মানুষ তেমনি অদৃশ্য। তবে মানুষ ও ভূতের ইচ্ছায় ঠোকাঠুকি হইয়া গেলে তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পায়—মানুষ ও ভূতের জ্ঞানের মাধ্যম ইন্দ্রিয় নয়, ইচ্ছাশক্তি।

আবার যেন শুনিতে লাগিলাম—আমি ভাবিয়াছিলাম লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল। কত লোককেই তো বুঝাইয়াছি—কিন্তু তাহার মতো কেহ বুঝিতে পারে নাই। বলিয়াছিল লিখিবে। আমি বলিলাম—লিখিও, তুমি পারিবে, আর এসব গূঢ় কথা সকলকে জানাইবার প্রয়োজন আছে। ভাবিলাম একবার সেই ঘরটাতে খুঁজিয়া দেখি—যদি পাণ্ডুলিপিখানা পাই দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

থামিল। এবারে সে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না; বঙ্কিম, তুমি যে কি সুযোগ নষ্ট করিলে তাহা তুমি জানো না!

এতক্ষণে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি—কপালকুণ্ডলার কাপালিকের স্বপ্ন। আমার বঙ্কিমপ্রীতি আর কপালকুণ্ডলার দেশ, তার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে এই ঘরে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস, সবসুদ্ধ জড়াইয়া দিয়া একটা দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। ততক্ষণে লোকটা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে—অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর আলোয় দেখিতে পাইলাম—হাঁ, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মতো চেহারাটা! গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং হাতে প্রকাণ্ড একখানা চিমটা। লোকটা হন্‌হন্ করিয়া নামিয়া অগ্নি-শিখার দিকে চলিতে লাগিল। তাই বটে,—অদূরে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—তাহারই আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

এবারে বিশ্বাস পাকা হইল যে এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—এবারে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা অনেকটা হইয়াছে। লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। প্রথমেই স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়িল। ভাবিলাম এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে! আবার ভাবিলাম স্বপ্নই যদি দেখিতে হয় তবে স্বপ্নদর্শনের এমন দেশ কাল পাত্র আর কোথায় পাইব। বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম—অগ্নিকুণ্ডের চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যাইতেছে না। ভাবিলাম স্বপ্নের আবার চিহ্ন কি?

পায়ের জুতা জোড়ার ফিতা বাঁধিবার জন্য মুখ নীচু করিবার সময় চমকিয়া উঠিলাম—এ কি! বারান্দায় এ কাহার পদচিহ্ন? আমার হইতেই পারে না, আমার পায়ে সর্বদা জুতা ছিল। এ খালি পায়ের চিহ্ন, তাহা ছাড়া এত বড় পা আমার নয়! কাদাবালুমাখা মস্ত একখানা পায়ের ছাপ! স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের দেহায়তনের অনুপাতিক ছাপ! তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পালাইবার উদ্দেশ্যে ভিতরে টিপবাতি আনিতে গেলাম—মেঝেতে আর একটি ছাপ! তবে তো স্বপ্ন নয়! স্বপ্নমূর্তির কি ছাপ পড়ে? নিশ্চয়ই ঘরে কেহ ঢুকিয়াছিল। কে সে? কেন ঢুকিয়াছিল? আমাকে দেখিতে পায় নাই? না, দেখিয়াও গ্রাহ্য করে নাই? কিন্তু সে যে স্বপ্নমাত্র নয় সে কথা নিশ্চিত! আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার সাহস হইল না। বারান্দা হইতে নামিয়া পথের দিকে দ্রুত যাত্রা করিলাম—পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সাহসটুকুও হইল না।

কিছুদূর যাইতেই একটি লোককে দেখিতে পাইলাম—তাহাকে আমার মোটর বিগড়ানোর সংবাদ জানাইয়া বলিলাম যে একটু সাহায্য করিতে হইবে। সে রাজি হইয়া শুধাইল—কিন্তু কাল সারা রাত্রি ছিলেন কোথায়?

আমি বলিলাম—কেন ওই ভাঙা ঘরখানায়!

সে বিস্মিত হইয়া বলিল—ঘর? এখানে ঘর আসিল কোথা হইতে?

—কেন ওই যে! বলিয়া আমি ফিরয়াই ইঙ্গিত করিয়া নিজেই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। ঘর কোথায়? একখানা শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে মাত্র।

লোকটা কি ভাবিল জানি না। হয়তো ভাবিল আমি তাহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছি, হয়তো ভাবিল আমি মাতাল। আরো কত কি ভাবিল কে জানে। অধিক ভাবিবার সময় না দিয়া তাহাকে লইয়া আমি মোটরখানার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমার ভাবনার অবসান ঘটিল না। আজিও ঘটে নাই? কি দেখিলাম? কোথায় ছিলাম? এ সমস্যার সমাধান আজিও খুঁজিয়া পাই নাই।

চিল্কা রায়ের গড়

আরে সেই কথাই তো এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চেষ্টা করছি।

—আমরাও বুঝতে চেষ্টা করছি।

—তবে গোল বাধছে কোথায়?

—তুমি বলছ ঐ আওয়াজ বাংলা দেশের কেবল দক্ষিণ অঞ্চলেই শুনতে পাওয়া যায়।

—তা বলছি বটে, তবে ঐ সঙ্গে আর-একটু জুড়ে দিতে রাজি আছি, বাংলা দেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে যে-শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, তা কাছাকাছি অন্য প্রদেশের সমুদ্রতীরেও শুনতে পাওয়া যেতে পারে। কাল্পনিক উদাহরণেই বা প্রয়োজন কি? উড়িষ্যার কোন কোন স্থান থেকেও শুনতে পাওয়া যায় বলে রিপোর্ট পেয়েছি।

—কিসের রিপোর্ট পেলে হে? এখানে এই পাণ্ডববর্জিত রাজ্যে এসেও রিপোর্টের হাত থেকে রক্ষা নাই।

অরবিন্দ প্রবেশ করিয়া কথাগুলি বলিল।

আমরা দুইজনেই বলিয়া উঠিলাম, এসো অরবিন্দ। এতক্ষণ তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, চলো বেড়াতে বেরুবার সময় হ'য়ে গিয়েছে।

—তা তো হয়েছে, কিন্তু কিসের রিপোর্ট না শুনে বেড়াতে যাচ্ছি না।

—তা না হয় বেড়াতে বেড়াতেই হবে, কি বলো?

—সে মন্দ নয়, চলো।

তিনজনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রিপোর্ট-রহস্যে নামিবার আগে আমাদের তিনজনের যে পরিচয়টুকু গল্পের পক্ষে অপরিহার্য, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

আমি সরকারী জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের অফিসার। কিছুদিন ঘোরতর খাটুনি গিয়াছে। এখন বিশ্রামের আশায় আসিয়াছি, আমার বন্ধু প্রবোধচন্দ্রের আশ্রয়ে। অরবিন্দ প্রবোধের বন্ধু ও প্রতিবেশী দুইজনেরই

অনেকগুলি করিয়া চায়ের বাগান আছে, কাঠের ব্যবসাও আছে, তাছাড়া প্রচুর চাষের জমির তারা মালিক, এসব অঞ্চলে জমির দুর্ভিক্ষ নাই।

প্রবোধের আশ্রয়ে আগেও একাধিকবার আসিয়াছি, কাজকর্মের চাপে পীড়িত হইয়া পড়িলে ছুটি লইয়া এই নির্জনপ্রায় স্থানে আসিয়া কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকি। এবারেও ফাল্গুনের প্রথমে আসিয়াছি—ইচ্ছা আছে ভালোভাবে গরম না পড়িলে ফিরিব না।

এখানে আমার প্রধান কাজ পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানো ; বিকাল বেলায় প্রবোধ ও অরবিন্দর সঙ্গে নদীর ধার বরাবর বেড়ানো ; তাহাদের অবকাশের দিনে কাছে-ভিতে যেসব পাহাড় ও জঙ্গল আছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা ; আর প্রচুর খাদ্য গ্রহণ ও প্রচুরতর গল্প-গুজব করিয়া আড্ডা জমানো।

স্থানটি কুচবিহার ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত, পল্লীর চেয়ে বড়, শহরের চেয়ে ছোট। ভূভারতে এত স্থান থাকিতে এই জায়গাটিতে যে বারংবার আসি তার কারণ, একবার দেখিলে পাঠক তুমিও ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে। এমন নদী, পাহাড় ও অরণ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুসজ্জিত, অথচ লোকালয়ের সুখ-সুবিধা সম্পন্ন নির্জন স্থান আমি তো আর দেখি নাই।

কাল—ফাল্গুনের প্রথম, শীত বেশ প্রবল।

—কি হে, কিসের রিপোর্ট। বেশ নির্জন জায়গা, মন খুলে বলো কেউ শুনে ফেলবে সে ভয় করো না।

—তবে শোন।

এই বলিয়া আরম্ভ করিলাম।

—জিওলজিক্যাল সার্ভেতে মানুষে যেন না ঢোকে। জগতে যেখানে যত বনবাদাড়, পাহাড়পর্বত, নদীসমুদ্র আছে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হবে। একবারের কথা মনে আছে। অনেকদিন আগের ঘটনা, গিয়েছিলাম আসামে মিশমি পাহাড় জরিপ করতে, বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, সাত দিনের মধ্যে নিজের দলের কটি লোকের মুখ ছাড়া মানুষের মুখ দেখিনি, এমন কি একটা আদিবাসীর মুখ পর্যন্ত না। এমন চাকরি মানুষে করে ? ছিঃ, ছিঃ !

এই কি তোমার রিপোর্ট নাকি ?

—তুমি দেখছি রিপোর্ট না শুনে নিতান্তই ছাড়বে না, বলছি, বলছি। এবারে কিছুদিন আগে যে বড়সাহেব বিলাত থেকে এসেছেন তাঁর আবার

বিজ্ঞানের বাতিক আছে। তিনি ওদেশে থাকতেই, বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে তোপধ্বনির মতো যে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় সাধারণে যাকে 'বরিশাল গান' বলে থাকে, তার সংবাদ শুনেছিলেন। আফিসে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, রায়, তুমি বাঙালী, তাতে বৈজ্ঞানিক, তাতে সিনিয়ার অফিসার, ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে চেষ্টা করো না কেন! সাহেব বলিলেন, তোমাকে যথেষ্ট সুবিধা দেবো—কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক বিষয়ের একটা কিনারা হওয়া আবশ্যক!

—বোঝো একবার ঠেলা! আমি একে বাঙালী, তাতে বৈজ্ঞানিক, তাতে সিনিয়ার অফিসার, একেবারে ত্র্যহস্পর্শ যুক্ত, কাজেই আমার স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি গেল! সাহেব বলেছেন—অন্য যে কোন দেশ হ'লে এজন্য কত টাকা খরচ হ'ত, লোকের মনে বড উৎসাহ হ'ত! এমন ক্ষেত্রে আমার আগ্রহে শৈথিল্য নিতান্তই অমার্জনীয়। তাতে বড় সাহেব সত্যসত্যই সাহেব অর্থাৎ বিদেশী। হ'ত দেশী বড় সাহেব, একবার দেখে নিতাম।

—ওসব শুভ সঙ্কল্প থাক, কি করলে শুনি।

—কি আর করবো। বের হ'য়ে পড়লাম। বঙ্গোপসাগরের তীর বরাবর ঘোরা শুরু হ'ল। কখনো স্টীমারে, কখনো রেলে, কখনো নৌকায়, কখনো কখনো মোটর গাড়ী ব্যবহারও করেছি। তখন বর্ষাকাল, কষ্টের একশেষ।

—শীতকালে বেরুলে এত কষ্ট হ'ত না।

—কিন্তু তার উপায় কি? বড় সাহেব যে বৈজ্ঞানিক। তিনি শুনেছেন 'বরিশাল গানের' আওয়াজ বর্ষাকালেই প্রবল হ'য়ে থাকে।

—কিরকম প্রবল আওয়াজ শুনলে?

—প্রবল যে সন্দেহ নেই। বরিশাল থেকে খুলনার মধ্যেই সবচেয়ে প্রবল, চব্বিশ পরগণার দিকে তুলনায় কম। এক একদিন রাত্রে ঘুম হ'ত না। যেমন গম্ভীর, তেমনি ঘন ঘন! মনে হ'ত পৃথিবীর কোন্ সুগভীর থেকে ওঙ্কার ধ্বনি উঠছে। মনে হ'ত একসঙ্গে সহস্র কামান যেন গর্জাচ্ছে!

—ব্যাপারটা সত্যই রহস্যজনক।

—ঐ অঞ্চলের সাধারণ লোকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করি. তোমরা বলতে পারো কিছু? কেউ বলে নদীর স্রোতে আর সমুদ্র-তরঙ্গে

ঠোকাঠুকির শব্দ, কেউ বলে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে অতলস্পর্শী সব গহ্বর আছে তারই মধ্য থেকে উঠছে, সবাই বলে জন্ম থেকেই আওয়াজ শুনছে আর বলে যে আসল কারণ কেউ জানে না।

—তাদের যখন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা তো মাছ ধরতে সমুদ্রের জলে যাও, কিছু হদিস পাও না ?

—তারা বলে আমরা কি লেখাপড়া জানি কর্তা! একজন বলল, আমরা একবার স্রোতের টানে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তখন আওয়াজ শুনেছিলাম উত্তর দিকে।

—আর অন্য সময়ে ?

সে বলল—এখন যেমন শুনছি, দক্ষিণ দিকে, কখনো পূব-ঘেঁষা দক্ষিণ, কখনো পশ্চিম-ঘেঁষা দক্ষিণ। সেই একবার উত্তর দিকে শুনেছিলাম।

—বুঝলে প্রবোধ এইভাবে তিন মাস কাটলো।

—সিদ্ধান্ত কি করলে ?

—যথা পূর্বং তথা পরম। তবে এটুকু বুঝলাম যে ঐ শব্দের সঙ্গে সমুদ্রের একটা যোগাযোগ আছে। কারণ সমুদ্রতীর ভিন্ন শুনতে পাওয়া যায় না···ওটা কিহে ? নদীর ওপারে ?

প্রবোধ। ওঃ, কথায় কথায় অনেকদূর চলে এসেছি। তুমি এদিকে বুঝি আগে আসনি ? ওটা চিলা রায়ের গড়।

আমি। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি কালো। যেন অমাবস্যার পাথর কেটে গড়া হয়েছে।

প্রবোধ। প্রকাণ্ড সন্দেহ নেই, তবে কালো নয়, অন্ধকার বলেই কালো দেখাচ্ছে।

এতক্ষণে হুঁশ হইল! চারিদিকে আলকাতরা-গোলা অন্ধকার। এমন সূচীভেদ্য নিরেট যে, ক্ষণে ক্ষণে জোনাকির ঝুলবাতি না হইতে থাকিলে অন্ধকারের প্রতীতি হইত কিনা সন্দেহ।

অরবিন্দ। আজ আবার অমাবস্যা। চল ফিরি।

সকলে ফিরিলাম। বাড়ীর কাছে আসিয়া অরবিন্দ বলিল, আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই, আমি চললাম।

সে চলিয়া গেলে আমরা দুইজনে বাড়ীতে ঢুকিলাম।

হাতমুখ ধুইয়া দুইজনে মুখোমুখী বসিতেই পুরাতন প্রসঙ্গ উঠিল।

প্রবোধ। সাহেবকে রিপোর্ট দিলে?

—সব খুলে বললাম।

প্রবোধ। সাহেব কি বলল?

—সাহেব বলল, প্রথমবারে সম্পূর্ণ কিনারা না হ'লেও নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। সাহেব বলল যে, আগামী বর্ষাকালে স্বয়ং সে বের হবে। বুঝলে প্রবোধ আমি তখন ছুটি নেবো।

প্রবোধ। সাহেব উৎসাহ পেলো কিসে?

—তা পাবে না। ঐ শব্দের প্রসঙ্গে দুটো কারণ সুনিশ্চিত, কাল বর্ষা, আর স্থানটা সমুদ্রোপকূল! ঐ দুটোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আসল রহস্যটা।

—তোমার সাহেবকে এখানে নিয়ে আসতে পারো?

—কেন বলো তো।

—ঐ আওয়াজ শুনিয়ে দিতে পারতাম।

—এখানে? এই হিমালয়ের প্রান্তে?

—হাঁ, এবং তাও আবার বর্ষাকালে নয়, শীতকালে।

—'বরিশাল গান?'

—'বরিশাল গান' আর কেমন ক'রে বলি, স্থানটা যখন বরিশাল ব তার কাছাকাছি নয়!

—সাহেব খবর শুনলেই ছুটে আসবে, কিন্তু শেষে না অপ্রস্তুত হই

—কেন?

—তুমি শুনেছো?

—এ অঞ্চলের সবাই শুনে থাকে।

—শুনে থাকে! তার মানে আওয়াজ প্রায়ই হয়।

—না, বৎসরে একদিন মাত্র।

—একটা দিন?

—বলা উচিত ছিল একটা রাত্রি।

—কিসের আওয়াজ?

—লোকে কামান গর্জন বলে থাকে!

—কি আশ্চর্য! এখানে? ঠিক কোথা থেকে ওঠে বুঝতে পারো?

—চিলা রায়ের গড়টা দেখেছ তো! ওখান থেকে।

—গড় থেকে?

—না, লোকদের ধারণা নদীর মধ্য থেকে সেদিন চিলা রায়ের কামান ওঠে।

—না, ভাই, আর সাহেবকে আনা চললো না দেখছি! এসব 'কামান ওঠা' রূপকথা বলতে গেলে আমার চাকরি থাকবে না।

—এটা ফাগুনের অমাবস্যা না হ'য়ে মাঘের অমাবস্যা হ'লে তোমাকে আজই শুনিয়ে দিতে পারতাম!

—রহস্য ক্রমেই ঘনতর হ'য়ে জমে উঠছে। কি জানো খুলে বলো।

—তবে স্থির হ'য়ে বসো। যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি তা কারো প্রত্যক্ষ নয়, কারণ এ বহু শত বৎসর আগেকার কথা। সেই দূর সময় থেকে এই নিদারুণ স্মৃতি মুখে মুখে সঞ্চারিত হ'য়ে আজকার দিনে এসে পৌঁছেছে। মিথ্যা বলবার উপায় নেই— প্রত্যক্ষ প্রমাণ কামান গর্জন!

—কিংবা কামান গর্জনকে কেন্দ্র ক'রে একটা কাহিনী পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে।

—তবু কামান গর্জনটা থেকেই যাচ্ছে, আর তোমারও তো আগ্রহ ঐ ব্যাপারটা নিয়ে—

—গল্পটাতেও আগ্রহ অল্প নয়, কি জানো জমিয়ে বলো।

—জমাবার প্রয়োজন হবে না, এ কাহিনী নাটকে আর চোখের জলে পূর্ণ।

—বলো, আর ভূমিকা নয়।

—তবে শোনো।

প্রবোধ গায়ে কাপড় জড়াইয়া বসিয়া আরম্ভ করিল। ঘরের মধ্যে আমরা দুটি প্রাণী, স্তিমিত আলোতে দেয়ালে মস্ত দুটি ছায়া, বাড়ী নির্জন, বাহির নির্জনতর, নিস্তব্ধতার আর অন্ধকারের যুগল আস্তরণে চরাচর নিরেট নীরন্ধ্র করিয়া জড়ানো!

ঐ যে ভাঙা গড় দেখলে ওটা চিলা রায়ের গড় নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে ওটা নীলধ্বজ রাজার দুর্গ। চিলা রায় তার ছোট ভাই, তার প্রকৃত নাম শুক্লধ্বজ। সে ছিল নীলধ্বজ রাজার সর্বজয়া সেনাপতি। চিলের

মতো সে অতর্কিতে শত্রু সেনার উপর গিয়ে পড়ে তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলতো, তাই লোকে তার নাম দিয়েছিল চিলা রায়।

চিলা রায়ের বাহুবলে ভুটানের প্রান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র অবধি সমস্ত ভূখণ্ড বিজিত হয়েছিল—এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিল বড় ভাই নীলধ্বজ। দুই ভাইয়ের মধ্যে যেমন সৌহার্দ্য তেমনি সহযোগিতা ছিল। নীলধ্বজ ছিল সুশাসক রাজা, তার শাসনে হিন্দু মুসলমানে, ভুটানী বাঙালীতে ভেদজ্ঞান করা হ'ত না, আর চিলা রায় ছিল বীর্যবান সেনাপতি। ভুটানীরা অনেক বার আক্রমণ করতে এসে তার হাতে মার খেয়ে ফিরে গিয়েছে, যেমন প্রতিহত হ'য়ে ফিরে গিয়েছে দরং, কামরূপ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের সামন্ত রাজন্যগণ।

—চিলা রায়ের বীরত্বের রহস্য কি ছিল, পদাতিক না ঘোড়সোয়ার?

—বীরত্বের আসল রহস্য নিহিত থাকে বীরের প্রকৃতির মধ্যে, ঘোড়-সোয়ার, পদাতিক গৌণ। তবু প্রশ্নটা তুলে ভালো করেছ।

চিলা রায়ের বীরত্বের সহায় ছিল—একটি প্রকাণ্ড কামান। কামানটা নাকি সতেরো হাত লম্বা ছিল, আর বসানো ছিল চারটে বড় বড় চাকার উপরে, টানবার জন্য জুড়ে দেওয়া হ'ত আট জোড়া ভুটানী ঘোড়া। কামান-টার পাল্লা ছিল যেমন লম্বা, তেমনি তার গর্জন। সেই কামান যখন ডাকতো চারদিকের পাহাড় প্রতিধ্বনি ক'রে ক'রে তার আওয়াজ ছুঁড়ে দিত দূর থেকে দূরান্তরে, সেখানে যত শত্রু আছে সতর্ক হ'য়ে যেতো। চিলা রায় তার কামানের নাম দিয়েছিল—কালু খাঁ।

কোথায় পেলো সে এই অমোঘ অস্ত্র কেউ জানতো না, এমন কি নীলধ্বজ রাজাও নাকি জানতো না, কিংবা জানলেও ভাইয়ের গুপ্ত রহস্য সে কাউকে জানায়নি।

ঐ কামানটা নিয়ে তখন নানা রকম কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। কেউ বলে তরাইয়ের অরণ্যে গিয়ে মহাদেবের সাধনা ক'রে কামানটা কিরাতরূপী মহাদেবের কাছে থেকে বর পেয়েছিল। কেউ বলে নেপাল না তিব্বত কোথাকার রাজা তার বীরত্বে খুশী হ'য়ে তাকে পুরস্কার দিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলে—ওটা ছিল আগেকার কোন্ এক মহাবীরের অস্ত্র। সেই বীরের মৃত্যুর পর কামানটা নাকি ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে ডুব দিয়েছিল। একবার চিলা রায় চলেছিল দরং রাজার সঙ্গে যুদ্ধ

করতে। মাঝ পথে ব্রহ্মপুত্রের ধারে সে শিবির সন্নিবেশ করছে, সন্ধ্যাবেলা একাকী ঘুরছে সে নদীর ধারে, এমন সময়ে দেখতে পেলো যেন প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ উঠে আসছে জল থেকে! বিস্মিত হ'য়ে চিলা রায় ভাবছে, ব্যাপার কি? এমন সময়ে দৈববাণী হ'ল—এই কামান নিয়ে যাও, তুমি সর্বত্র শত্রুজয়ী হবে। কামানের পূর্ববর্তী মালিকের শত্রু নাকি ছিল দরং রাজ! সেই থেকে, সেই কামান পাওয়ার পর থেকে চিলা রায় একেবারে অপরাজেয় হ'য়ে উঠল। লোকের মুখে মুখে কালু খাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো; শত্রুরা কাছে ঘেঁষতো না, যারা তেমন দুঃসাহস দেখাতো, নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে যেতো কালু খাঁর কবলে। তখন দুই ভাই নীলধ্বজ আর শুক্লধ্বজ নিশ্চিত হ'য়ে এসে বসলো এই গড়ে—ভাবলো এবার সুখশান্তিতে রাজ্য শাসন করবে, যুদ্ধ তো সুশাসনের লক্ষ্য নয়, তার অপরিহার্য ভূমিকামাত্র।

—এমন সময়ে ভুটানের দেব রাজার মৃত্যু হ'ল। নূতন রাজা নীলধ্বজকে বলে পাঠালেন যে, তিনি উপঢৌকনাদিসহ নীলধ্বজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছায় দুই রাজ্যের সীমান্তের দিকে আসছেন। এ-রকম দেখা-সাক্ষাৎ দুই রাজ্যের রাজার সঙ্গে মাঝে মাঝেই হ'ত। এতে নূতনত্ব কিছু ছিল না। বিশেষ নূতন সিংহাসন লাভ করবার পরে ভুটানরাজ যে দেখা করতে আসবেন, তা তো খুবই স্বাভাবিক।

চিলা রায় বলল—দাদা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

নীলধ্বজ বলল—তার কি দরকার ভাই। এতো যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, মামুলী সৌজন্য মাত্র। তার চেয়ে তুমি দরং রাজ্যের দিকে যাও। দরং রাজ আবার আমার রাজ্য আক্রমণ করবার উদ্যোগ করেছেন বলে সংবাদ পেয়েছি!

তাই স্থির হ'ল। নীলধ্বজ প্রচুর উপঢৌকন ও কিছু লোকজন নিয়ে চলল সীমান্তের দিকে, আর চিলা রায় কালু খাঁকে নিয়ে চল্‌ল—আসামের পথে। তখন কে জানতো যে দুই ভাইয়ে সেই শেষ দেখা।

ভুটান সীমান্তে ভুটান রাজ ও নীলধ্বজের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'ল, উপঢৌকন বিনিময় হ'ল। ভুটান রাজ দেখলে যে সঙ্গে চিলা রায় নেই, নেই তার অমোঘ কালু খাঁ। তখন সে সাহস পেয়ে সপরিচর নীলধ্বজকে বন্দী ক'রে সেখানেই হত্যা করলো। এ খবর চিলা রায়ের কাছে পৌছে দেবার লোকটা অবধি

রইলো না। এই ঘটনা যখন ঘটেছে, তখন চিলা রায় দরং রাজের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। যেদিন দরং রাজ পরাজিত হ'ল জনশ্রুতি যোগে নিদারুণ দুঃসংবাদ গিয়ে পৌঁছলো চিলা রায়ের কাছে। চিলা রায় তখনি কালু খাঁকে নিয়ে দেশের দিকে রওনা হ'ল।

এ দিকে ভুটান রাজ নীলধ্বজের গড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। সমস্ত নরনারী স্ত্রী-পুরুষ সে হত্যা করলো—আর লুটতরাজ তো করলোই। এমন সময়ে তার কানে পৌঁছলো যে চিলা রায় আসছে। তখন সে নীলধ্বজের দুর্গ, যা এখন চিলা রায়ের গড় নামে পরিচিত, তা ভেঙে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে দেশের অভিমুখে পলায়ন করলো।

ওদিকে চিলা রায় ষোল-ঘোড়াবাহিত কালু খাঁকে নিয়ে গড়ের কাছে এসে পৌঁছলো। তখন রাত্রি, সে রাত্রি আবার এমনি অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার। চিলা রায় দূর থেকে দেখলো দুর্গে একটিও বাতি জ্বলছে না—আরও কাছে এসে দেখলো, দুর্গ আর দুর্গ নেই ভগ্নস্তূপ, আপন প্রেতাত্মার মতো তার ভগ্নাবশেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছাকাছি গ্রামের লোকের নিকটে সব সংবাদ সে শুনল, শুনে সেই দুর্ধর্ষ বীর কামানের উপর বসে পড়ল। সেই প্রথম চিলা রায় হতাশ হ'ল, সেই প্রথম আর শেষ! অনেকক্ষণ পরে উঠে চারিদিকে ঘুরে-ফিরে দেখল—আর কিছু করবার নেই, সত্যই সব শেষ

লোকে বলল—ভুটান রাজাকে ভুটানে গিয়ে আক্রমণ করা যাক! কিন্তু চিলা রায় ভাবলো—তাতে কি ফলোদয় হবে? যুধিষ্ঠিরের মতো ভাই কি ফিরবে? ফিরবে কি দুইজনের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ফিরবে কি অপহৃত সম্মান? তখন সেই অজেয় বীর, দিগ্বিজয়ী সেনাপতি, লক্ষ্মণসম ভ্রাতা যা করলো, তা বীর ছাড়া কেউ করতে পারে না, আর ভগ্নহৃদয় বীর ছাড়াও কেউ করতে পারে না। সে নিজেকে কালু খাঁর সঙ্গে বেঁধে—ঐখানে, গড়ের কাছে ঐ নদীতে আত্ম-বিসর্জন করলো। কালু খাঁ চিরদিনের জন্য নীরব হ'ল।

—ওখানে কি নদীতে অনেক জল?

—একেবারে অতলস্পর্শ। গ্রীষ্মকালেও দড়ি নামিয়ে নামিয়ে থই পাওয়া যায় নি। এইমাত্র বললাম যে কালু খাঁ চিরদিনের জন্য নীরব হ'ল। কিন্তু ঠিক তা হ'ল না। প্রতি বৎসর মাঘী অমাবস্যার রাত্রে কালু খাঁ তীরে উঠে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে নাকি গর্জন আর গোলাবর্ষণ করে!

—গল্পই, তবে সে গর্জন অনেকেই শুনেছে। আমিও কতবার শুনেছি।

—বোধ করি মেঘের ডাক ?

—মাঘ মাসে মেঘ কোথায় ?

—আর কিছু হবে ?

—আর কি হ'তে পারে ?

—এ বছর মাঘ মাসে—

—কই এখনো শুনছি বলে মনে হয় না।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম !

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম !

—ও কি ?

—তাই তো ও কি ?

—ঐ তো কালু খাঁর গর্জন !

—কিন্তু আজ তো ফাল্গুন মাস !

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেখি—এই বলিয়া প্রবোধ ছুটিয়া গৃহান্তরে গেল এবং এক লহমার মধ্যে একখানা পঞ্জিকা হাতে ছুটিয়া আসিল, বলিল—এবারে মাঘী অমাবস্যা ফাল্গুনে পড়েছে।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম।

আমি একটা বিজলী বাতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

—ওকি, ওকি, কোথায় চললে ?

ছুটিতে ছুটিতে বলিলাম—দেখি, কিছু দেখা যায় কি না ?

আমার পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে প্রবোধ বলিল—ফেরো ফেরো, ওদিকে আজ কেউ যায় না। কখনো, কখনো যারা গিয়েছে, তারা ফেরেনি !

—ওসব কুসংস্কার রাখো।

—দোহাই তোমার ফেরো।

দুইজনেই নদীর তীরে গড়ের অভিমুখে ছুটিতেছি।

কামান গর্জন ক্রমশঃ ভীষণতর হইতেছে, তার মানে আমরা নিকটতর হইতেছি।

একবার মনে হইল নদীর ওপারে একটা আগুনের মতো যেন দেখিলাম !

আরো কাছে আসিয়াছি। একবার মনে হইল গড়ের কাছে প্রকাণ্ড অজাগরী একটা বস্তু ! বোধ করি আমার কল্পনামাত্র।

এবারে দু'জনে নদীতীরে, সেই সান্ধ্য ভ্রমণের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

বিজলী আলোর পিচকারি ফেলিয়া দেখিলাম ওপারে অদূরে গড়ের ভগ্নস্তূপ আর কোথাও কিছু নাই। এবার নদীগর্ভে আলো ফেলিলাম। নিবাতনিস্পন্দ জলতল আলোড়িত হইতেছে—খুব ভারী একটা পদার্থ এইমাত্র ডুবিয়া গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।

তবে কি শত্রু নিধন আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া কালু খাঁই ডুব দিল নাকি?

সেখানে অন্ধকার জলতলের ক্রমঃক্ষীয়মান আলোড়নের দিকে তাকাইয়া দু'জনে মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম, রহস্যের কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।

আজিও পাই নাই, গর্জন যে মিথ্যা নয়, স্বকর্ণে যে শুনিয়াছি, তাহা খোদ সাহেবের সম্মুখেও সাহস করিয়া বলিতে পারি।

নিশীথিনী

শিংভূম জেলা আদিম পাহাড় ও অরণ্যে পরিপূর্ণ। উত্তরাপথ যখন মহাসমুদ্রের অংশ ছিল, প্রাগৈতিহাসিক জলচর জীবেরা যখন অতিকায়িক বপু লইয়া সেই বিশাল জলময় মরুতে সন্তরণ করিত শিংভূমের ভূখণ্ডে তখন প্রাচীন শ্বাপদ ও প্রাচীন উদ্ভিদ দেখা দিয়াছে। মানবহীন নির্জনতায় তাহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত, পাহাড়ের গুহায় গুহায় তাহাদের আবাস ছিল, প্রাচীন স্বুবর্ণরেখার বারি পান করিয়া তাহারা তৃষ্ণা মিটাইত। সুবর্ণ-রেখা গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্রের তুলনায় কৌলিন্যে দীন হইলেও অস্তিত্বের দলিল তাহার অনেক বেশি পাকা।

শিংভূমের পাহাড় পর্বতরাজ হিমালয়ের আত্মীয় নয়, তাহাদের সগোত্রত্ব বিন্ধ্যপর্বতের সহিত। এ সব পাহাড় বিন্ধ্যপর্বতের দূরাতিদূর জ্ঞাতিবন্ধু। এখানকার অরণ্যমালাও প্রাচীন। তাহাদের শাখা-প্রশাখায় যে বাণী মর্মরিত হইয়া ওঠে—তাহার ভাষা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের বনস্পতিদের অজ্ঞাত। হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গয়র প্রভৃতি যে-সব শ্বাপদ এখানে বাস করে—অরণ্যের তুলনায় তাহারা এতই অর্বাচীন যে অরণ্য তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করে না। এখানকার আদিম অরণ্য ও পর্বত চিরস্থায়ী রাত্রির মতো শিংভূমের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে—সেই রাত্রির বুকে দুঃস্বপ্নের মতো শ্বাপদের দল ঘুরিয়া বেড়ায়—স্বপ্নের গোঙানির মতো তাহাদের গর্জন নিস্তব্ধতাকে কণ্টকিত করিয়া তোলে। সেই অন্ধকারের সীমানা ঘেঁষিয়া জমাট অন্ধকারে গড়া যাহাদের দেহ সেই আদিবাসীর দল বাস করে—তাহারা আধুনিক শহর ও জনপদে বড় আসে না। শিংভূমের এমন অনেক অঞ্চল আছে সভ্য মানুষ এখনও সেখানে প্রবেশ করে নাই।

আজ এমনই একটি স্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি।

নরসিংগড় শিংভূম জেলার একটি ছোট জায়গা, বেশি লোকের নজর এখানে পড়ে নাই, কিন্তু ভ্রমণরসিকেরা জানে শিংভূমের পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে

প্রবেশের সিংহদ্বার এই ছোট জায়গাটি। এখানে একটি ডাকঘর আছে, আর আছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের একটি অফিস। এখানকার অফিসের ছোট সাহেব আমাদের একজন বন্ধু। তার নাম তরুণ গুপ্ত। সে অনেকবার লিখিয়াছে যে বেড়াইবার শখ থাকিলে আমরা যেন সেখানে যাই—শখ মিটাইয়া দিবে। কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া হয় না। সেবারে বড়দিনের ছুটিতে প্রকাশ নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া নরসিংগড়ে গিয়া পৌছিলাম। তখন সন্ধ্যাকাল। গুপ্ত স্টেশনে উপস্থিত ছিল। কাছেই তার সরকারী বাসা। গুপ্ত অবিবাহিত। কাজেই তিনজনে মিলিয়া নিঃসপত্ন অধিকারে রাত্রিটা বেশ কাটিল। আহারাদির পরে গুপ্ত বলিল—কাল তোমাদের নিয়ে বের হব।

সে বলিল—আমার জিপ আছে, পাহাড়ে চলে বেড়াতে জিপের জুড়ি নেই। এমন সব জায়গায় যাবো—যার জুড়ি ভারতবর্ষে পাবে না, এক মধ্য আফ্রিকার অরণ্যে গেলে তার দোসর মিলবে।

রাত্রি ভোর হইলে বারান্দায় বাহির হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ দুইদিকে দেখিয়া লইলাম। দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে সুবর্ণরেখা নদী—তারপরে মাঠ, মাঠের পরে পাহাড়ের শ্রেণী—ভাঁজে ভাঁজে পাহাড়, কতদূর আন্দাজ করা সম্ভব নয়। আর উত্তর-দিকের পাহাড় আরও কাছে—সে পাহাড়ের শ্রেণীরও অন্ত নাই।

এমন সময় গুপ্ত বাহিরে আসিল, বলিল—পাহাড় দেখ্‌ছ ?

সে বলিল ঐ দক্ষিণ দিকের পাহাড় আমার এলাকার বাহিরে—ওগুলো ময়ুরভঞ্জের পাহাড়।

তারপরে বলিল—উত্তর দিকের পাহাড়ে আমরা যাবো।

আহারাদি দশটার মধ্যে সারিয়া লইয়া আমরা তিনজনে জিপযোগে উত্তর দিকে রওনা হইলাম। গুপ্ত জিপ চালাইতেছে। সন্ধ্যার আগেই ফিরিব স্থির হইয়াছিল, কাজেই সঙ্গে সামান্য কিছু খাদ্যমাত্র লওয়া হইল।

মাঠের পথ ধরিয়া জিপ ছুটিতে লাগিল—দুইদিকে মাঠে আমগাছ, মহুয়া গাছ, শাল, হর্তুকি, পিয়াশাল আরও কত কি গাছ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, কোনটা বাঙালীদের, কোনটা বা আদিবাসীদের। সবে ধান-কেটে-নেওয়া নেড়া মাঠ থাকে থাকে উঠিয়া নামিয়া দিগন্তে

মিশিয়াছে। জিপ অগ্রসর হইতেছে, পাহাড় ক্রমেই স্পষ্টতর হইতেছে। পাহাড়ের মাথায় অরণ্য। অবশেষে একটা পাহাড়ের গায়ে গাড়ি দাঁড়াইল।

আমি শুধালাম, কি, নামতে হবে নাকি ?

গুপ্ত বলিল—না।

তারপরে তিনজনে তিনটি সিগারেট খাওয়া শেষ করিলে গাড়ী আবার ছাড়িল। এবার গাড়ী পাহাড়ে উঠিতেছে, পথ সঙ্কীর্ণ, কোনরকমে কাজ চালানো গোছের।

গুপ্ত বলিল—বর্ষাকালে পথগুলো ধসে যায়—বর্ষার পরে ব্যবসায়ীরা আবার তৈরী ক'রে নেয়।

পাহাড়ে শালের গাছই বেশি—কিন্তু অন্য জাতের গাছও অল্প নয়—সে সব গাছ বাংলার মাটিতে বড় জন্মায় না। গধ, কেঁদ, পিয়াশাল। এবারে পাহাড়ের কাঁধে উঠিয়াছি, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ে থাকে থাকে পুঞ্জিত অরণ্য, ডানদিকে সুগভীর খাদ—ঝুঁকিয়া পড়িলে দেখা যায় অতিনিম্নে একটা শুভ্র স্বচ্ছ জলধারা—পাহাড়ের সর্বত্র তাহার গুঞ্জন শোনা যায়। ঐ একটিমাত্র গুঞ্জন একতারার একটি সুরের মতো ধ্বনিত হইতেছে। ইতিপূর্বে এমন নির্জনতাও দেখি নাই ; এমন নিস্তব্ধতাও জানি নাই। অথচ মনে হইতেছে চারিদিক শূন্য নয়—কেমন যেন একটা গম্‌গম্ ছম্‌ছম্ ভাবে সমস্ত পূর্ণ! নিস্তব্ধতার মধ্যে যে একটা পূর্ণতা আছে তাহা এই প্রথম অনুভব করিলাম। ডানদিকে খাদের অপর পারে একটা পাহাড়, তাহার গায়েও অরণ্যের মেঘ-জমা।

এবারে গাড়ী নামিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ীটা একটা সমতল মাঠে আসিয়া পড়িল! মাঠ বটে কিন্তু তার চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা ; পাহাড়ের পা হইতে চূড়া অবধি ঘন অরণ্যে ঠাসা। মাঠের মাঝে বেশি গাছ নাই—কতকগুলি গাছ এদিক ওদিকে ছড়ানো।

প্রকাশ শুধাইল—এসব বনে কি থাকে ?

তরুণ বলিল—সব রকম প্রাণীই থাকে, হাতী, বাঘ, ভালুক, বুনো মহিষ, বুনো শূকর আরও কত কি!

এ সব কথায় শহরবাসীর মনে ভয় জন্মানো অস্বাভাবিক নয় ভাবিয়া সে বলিল—কিন্তু ওরা দিনের বেলায় বের হয় না।

দিনের বেলায় বাহির হইলেই বা ক্ষতি কি ? এখানে দিনে রাতে প্রভেদ কোথায় ?

গুপ্ত বলিল—ঐ যে উঁচু মাচাটা দেখছ—ওটা চাষীরা হাতী তাড়াবার জন্যে তৈরি করেছিল।

অদূরে প্রকাণ্ড একটা আম গাছকে আশ্রয় করিয়া একটি উঁচু মাচা বাঁধা আছে বটে ! আর চাষীর উল্লেখে নজর পড়িল সম্মুখেই কয়েকখণ্ড ধান-কাটা নেড়া ক্ষেত।

আমি বলিলাম—হাতী কি এখানে আসে না কি ?

—আসে বই কি ! এই সেদিনেও এক পাল হাতী নেমেছিল।

তবে একটি নয়, একপাল। খুব আশ্বাসের সংবাদ বটে।

গাড়ী আসিয়া একটা পাহাড়ের নীচে থামিল।

গুপ্ত বলিল—এবারে নামা যাক ! সকলে নামিলে সে বলিল—ওখানে একটা বড় ঝরণা আছে—চলো দেখে আসি।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম, শাল, পিয়াশালের গাছে জায়গাটা অন্ধকার—কিন্তু বনভূমি বেশ পরিষ্কার, বাংলা দেশের বনের মতো আগাছায় আচ্ছন্ন নয়। শুঁড়ি পথ অসমতল, ছোট বড় পাথরে আকীর্ণ। আরও কিছুদূর আসিয়া জলধারার শব্দ কানে আসিল—একটা গাছের আড়াল কাটাইয়া চোখে পড়িল প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু হইতে একটি জলধারা সবেগে নীচে পড়িতেছে—এই সেই ঝরণা। ঝরণার ধারার নামে পাহাড়টার নাম ধারাগিরি।

ঝরণার কাছে আসিয়া তিনজনে দাঁড়াইলাম। জল পড়িয়া নীচে গভীর গর্ত হইয়াছে—তাহাতে জল সঞ্চিত। তরুণ বলিল যে বর্ষাকালে ঝরণা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া সমস্ত জায়গাটাকে প্লাবিত করিয়া দেয়। এখন শীতকালে ঝরণার ধারা সঙ্কুচিত। উপরে চাহিয়া দেখি ধাপে ধাপে পাহাড়, থাকে থাকে অরণ্য। ঐ ঝরণার ঝর্‌ঝর্ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বন্য পাখীর ডাক কানে আসিতেছে, কখনো বা এক-আধটা হাম্বারব—বুঝিতে পারা যায় নিকটবর্তী গ্রাম হইতে রাখালেরা গরু চরাইতে আসিয়াছে।

ঝরণার নিকট হইতে জিপ গাড়ীর কাছে যখন ফিরিলাম তখন অপরাহ্ণ।

তরুণ বলিল—জায়গাটা চারদিকে পাহাড়-ঘেরা ব'লে অন্ধকার এখানে অতর্কিতে এসে পড়ে।

সে আরও বলিল—হঠাৎ আলো হঠাৎ অন্ধকার এখানকার নিয়ম।

সে জানালো দিনের বেলায় এখানে যেমন ভয়ের কোন কারণ নেই সন্ধ্যার ছায়া নামবামাত্র তেমনি ভয়ের কারণ আসন্ন হ'য়ে ওঠে।

—ভয়টা কিসের ?

—বাঘ ভালুকের ?

—বাঘ ভালুকের তো বটেই—

—আবার কি হবে ?

তরুণ বলিল—সে কথা ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো না, কারণ তা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে, তবে অনেক লোকের মুখে শুনেছি যে—তারা সবাই যে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোক এমন নয়—তারা বলেছে যে—

—কি বলেছে খুলেই বলো না, এত ভূমিকা কিসের ?

—সুদীর্ঘ ভূমিকা করলেও ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো না, কারণ নিজেই বুঝিনি। যে সব কথা শুনেছি তা নিজের জ্ঞানের ও বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় না।

—চোর ডাকাত নিশ্চয়ই নয়।

—ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এখানে মহামূল্য জিনিস ফেলে গেলেও পরদিন ফিরে পাবে, খোয়া যাবে না।

—তবে আর কি হ'তে পারে ?

—সেই তো বুঝ্‌তে পারি না।

—ভূত প্রেত ?

—না, তাও ঠিক নয়! আমরা যাকে ভূত-প্রেত বলি তার আবাস লোকালয়ের কাছাকাছি। এ আর-এক রকম সত্তা।

প্রকাশ অধীর হইয়া বলিল—তুমি এইসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করি এমন বলিনি, তবে যারা বিশ্বাস করে, প্রত্যক্ষ করেছে তাদের কথাই বলছি।

—তারা হাম্বাগ্‌।

ততক্ষণে জিপের নিকট পৌঁছিয়া ফ্লাস্কে-ভরা চা আর টিফিন-বাস্কেটে-ভরা খাদ্যগুলা বাহির করিয়া তিনজনে খাইতে সুরু করিলাম।

আমি বলিলাম—খুলেই বলো না তারা কি বলেছে ?

তরুণ বলিল—বাড়ী ফিরে গিয়ে হবে।

—কেন এখানে ভয়টা কিসের ?

—ভয় ঠিক নয়। বাড়ী গিয়ে পৌঁছে ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে।

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে ভয়ের কারণ অল্প-স্বল্প আছে।

—আছে বলেই শুনেছি। ওসব আলোচনায় নাকি তারা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

—তারা কারা ?

—তারা একরকম ওআইল্ড স্পিরিট।

প্রকাশ বলিল—বনে ঘুরে ঘুরে তুমি বুনো হ'য়ে গিয়েছ দেখছি গুপ্ত !

—এতই যদি অবিশ্বাস, তবে আবার আগ্রহ কেন ?

—অহেতুক কৌতূহল ছাড়া কিছু নয়।

—রূপকথা শুনি বলে কি তাতে বিশ্বাসও করতে হবে? পক্ষীরাজ ঘোড়ায় তুমি কি বিশ্বাস করতে বলো ?

—আমি কিছুই বলি না। কিন্তু লোকে ঐরকম বিচিত্র পশুপক্ষী এখানে দেখতে পেয়েছে। যারা দেখেছে তারা তোমার আমার চেয়ে কম শিক্ষিত নয়, কম বুদ্ধিমান নয়।

এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে ?

—এখানে বিংশ শতাব্দী কোথায় ? একে খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার শতাব্দী বল্‌তে দোষ কি ? তুমি আমি বিংশ শতাব্দীর লোক, ঐ নরসিংগড় শহর বিংশ শতাব্দীর—কিন্তু এই পাহাড়, এই অরণ্য, এই সমতল ক্ষেত্র—একি বিংশ শতকের ? পাঁচ হাজার বছর আগে এসব যেমন ছিল আর পাঁচ হাজার বছর পরেও ঠিক তেমনি থাকবে। এখানকার সংস্কার স্বতন্ত্র।

—তোমার ফিলজফির ব্যাখ্যা রেখে আসল ব্যাপারটা কি খুলে বলো।

তরুণ আরম্ভ করিল—এদেশে যেসব আদি অধিবাসী আছে, সভ্য মানুষ আসবার আগেও তারা ছিল, তেমনি অদৃশ্যলোকে বা প্রেতলোকে এক শ্রেণীর আদি অধিবাসী আছে—তাদের বাস এইসব জায়গায়। মৃত মানুষের প্রেতাত্মার সঙ্গে তাদের একটা প্রভেদ আছে। প্রেতাত্মা অদৃশ্য লোকে আসে আবার পুনর্জন্ম নিয়ে চলে যায়। কিন্তু প্রেতলোকের আদিবাসীরা চিরকাল সমানভাবে বিরাজ করছে। তারা কোন মৃত মানুষের প্রেতাত্মা নয়—ঐভাবেই তাদের সৃষ্টি এবং স্থিতি। কিরকম

জানো, বিধাতা যেন তাদের গড়তে গড়তে অসম্পূর্ণ ক'রে রেখে তারপরে তাদের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছেন। তাই এদের জগতের নিয়মের সঙ্গে সাধারণতঃ আমরা যাকে প্রেত-জগৎ বলি তার নিয়ম মেলে না।

—তার মানে বল্‌তে চাও এ একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ?

—তাই বটে! এ-জগতের মানুষ, পশু, পাখী এমন কি গাছপালারও স্বতন্ত্র নিয়ম।

—অর্থাৎ ভূতে-পাওয়া গাছ? গুপ্ত তোমার রোগ চিকিৎসার বাইরে।

গুপ্ত হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—চলো, আর দেরী নয়।

তারপরে নিজের মনেই যেন বলিল—নাঃ, খুব দেরী হয়ে গেল।

—কেন এত ভয় কিসের?

সে এবারে বিরক্ত হইয়া বলিল—প্রকাশ, তোমার জানা জগৎ ছাড়াও যে অন্য নিয়মের জগৎ থাকতে পারে এই মোটা কথাটায় বিশ্বাস করতে পারো না কেন? অন্ধকার হবামাত্র এখানকার নিয়ম পালটে যায়। এটা আমার অভিজ্ঞতার কথা। নাও ওঠো।

জিপ ছুটিল। কিন্তু তর্ক-বিতর্কে যে আমরা কতক্ষণ কাটাইয়া দিয়াছি সে হুঁশ ছিল না। সমতল হইতে পাহাড়টার গোড়ায় আসিবার আগেই দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকার যে এমন অতর্কিতে আসিতে পারে সে ধারণা আমাদের ছিল না। গুপ্ত একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া এঞ্জিনে জোর দিল, আলো দুটা জ্বালাইয়া দিল—গাড়ী পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। পথ সরল নয়, ঘন ঘন মোড় ঘুরিয়াছে। একবার একটা মোড় ঘুরিতেই গুপ্ত অস্ফুটস্বরে নিজ মনে বলিয়া উঠিল—যা ভেবেছিলাম—

আমরা দু'জনে চকিত হইয়া উঠিলাম, ব্যাপার কি?

তিনজনেই দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ রুদ্ধ করিয়া বৃহদাকার কি একটা বস্তু পড়িয়া আছে।

গাছ? পাথর? না কোন বন্য জন্তু? জিনিসটার নড়া চড়া নাই। গুপ্ত এঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিল। আমরা বলিলাম—এ কি করলে? সে বলিল—যদি হাতী হয়?

—বুনো হাতী?

—বনে বুনো হাতী ছাড়া আর কি আসবে?

—এঞ্জিন বন্ধ করলে কেন ?

—অনেক সময়ে চার্জ করে।

এক মুহূর্ত পরে তিনজনেই একসঙ্গে দেখিলাম কোথাও কিছু নাই।

প্রকাশ হাসিয়া বলিল—গাছের ছায়া-টায়া হবে।

গুপ্ত বলিল—অন্ধকারে ছায়া পড়তে যাবে কেন ?

তারপরে বলিল—এ রকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। সামনে আর একটা খারাপ জায়গা আছে—সেটা পার হ'তে পারলেই—

—রাস্তা খারাপ ?

—না, জায়গাটাই খারাপ।

—তার মানে।

গুপ্ত অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল—এখানে নয় বাড়ী গিয়ে হবে।

যেন কাহার ভয়ে সে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নীচে নামাইয়া কথাটি উচ্চারণ করিল!

জিপ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে একটি মোড় ঘুরিল, দুদিকেই সমান অন্ধকার, একদিকে খাড়া পাহাড়, একদিকে গভীর খাদ; খাদের মধ্যে প্রবাহিত নদীর শব্দ এখন দিনের চেয়ে অনেক স্পষ্ট, সম্মুখে জিপের যুগল আলোয় প্রত্যক্ষ পথ, সম্মুখে কোন বাধা নাই। এমন সময়ে বারকয়েক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া এঞ্জিন থামিয়া গেল। অনেক সাধ্যসাধনাতেও এঞ্জিন আর চলিল না। প্রকাশ মোটর যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ, সে গুপ্তর পাশে বসিয়া ছিল, সেও সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু এঞ্জিন চলিবার বা গাড়ী নড়িবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

প্রকাশ বলিল—হঠাৎ এমন হ'ল কেন ?

গুপ্ত বলিল—হঠাৎ এমন নয়, আগেই আশঙ্কা ক'রেছিলাম। এ জায়গাটাতে রাত বিরেতে গাড়ী প্রায়ই খারাপ হ'য়ে থাকে।

—এখন কর্তব্য কি ?

গুপ্ত বলিল—ফিরে চলো—

—গাড়ী যে অচল—

—গাড়ী এখানে থাক্, আমাদের হেঁটে ফিরতে হবে—

—এই বলিয়া সে নামিয়া পড়িল, বিজলী বাতির মশাল জ্বালাইয়া চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—তোমরা এসো।

তিনজনে সারবন্দীভাবে ফিরিয়া রওনা হইলাম। পাহাড়ের উপর বেশী দূর উঠি নাই, অল্পক্ষণ পরেই সমতলে নামিয়া আসিলাম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হাতী-তাড়ানো সেই মাচাটার কাছে গুপ্ত আসিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময়ে এটাকে দেখিয়াছিলাম, একটা আমগাছকে আশ্রয় করিয়া মাচাটি বাঁধা।

গুপ্ত বলিল—উঠে পড়ো, আজ রাতটা এখানে কাটাতে হবে।

আমরা একসঙ্গে বলিলাম—একি ব্যবস্থা ?

গুপ্ত বলিল—তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, বেশীক্ষণ নীচে থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ ভালুক নিকটেই থাকতে পারে।

অগত্যা মাচায় উঠিলাম, গুপ্ত সব শেষে উঠিল।

মাচার বাঁশের পাটাতনের উপরে এক পত্তন খড় পাতা, উপরে খড়ের একটা ছাউনি।

একটু সুস্থ হইলে পরে গুপ্ত বলিল—তোমাদের এখানে এনে ভালো করিনি, আর আসলেও সময় মতো ফেরা উচিত ছিল।

—ভয়টা কিসের ?

—ভূত প্রেতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বাঘ ভালুকের ভয় তো আছে।

—অতএব ?

—এতএব কষ্ট ক'রে এখানে রাত্রিযাপন ব্যতীত উপায় নাই, এমন আরও একবার আগে ঘটেছে।

প্রকাশ বলিল—ভূত প্রেত দেখেছ নাকি ?

—না।

তাহার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরে কেমন যেন সন্দেহ হইল, বলিলাম, বাঘ ভালুক ?

—না, তাও দেখিনি।

বিজলী আলোকে ঘড়িতে দেখিলাম কেবল আটটা। কিন্তু এ কি নিশুতি! যেন ভুলিয়া-যাওয়া জগতের খনির ভিতরকার অন্ধকার!

সারা দিন ঘোরাঘুরি হইয়াছিল, কাজেই যাহার গায়ে যা গরম কাপড় ছিল তাহাই জড়াইয়া কোনরকমে শুইয়া পড়িলাম। ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

তখন কত রাত জানি না হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, জাগিয়া উঠিয়া দেখি সমস্ত বনে যেন ঝড় বহিতেছে, গাছের ডাল-পালার সে কি উদ্দাম মাতামাতি! কিন্তু আরও একটু সম্বিৎ হইবামাত্র বুঝিলাম যে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। সমস্ত অরণ্যটা নড়িতেছে—অথচ আমাদের গাছটায় একটুও সাড়া নাই—আর হাওয়া কোথায়! একটা বনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে যে প্রচণ্ড ঝড়ের দরকার তাহাতে মাচা-সমেত আমাদের উড়িয়া যাইবার কথা! কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ নাই।

ভাবিতে লাগিলাম এ অবস্থায় কর্তব্য কি! দেখিলাম প্রকাশ ও গুপ্ত অঘোরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। একবার মনে হইল তাহাদের জাগানো যাক্ আবার ভাবিলাম তাহাদের সুখস্বপ্নে ব্যাঘাত করিয়া কি ফল? দেখাই যাক না কতদূর কি হয়। এই ভাবিয়া গাছের একটা ডাল ঠেসান দিয়া সুস্থ হইয়া বসিলাম, ঘুমাইবার আশা অনেকক্ষণ বিসর্জন দিয়াছিলাম।

হঠাৎ অরণ্যের চঞ্চলতা থামিয়া গেল। চারিদিকে ঘুমন্ত শিশুর মতো নিস্তব্ধ হইল। হাওয়া যেমন মন্ত্রে উঠিয়াছিল তেমনি মন্ত্রেই যেন থামিল। চারিদিকে খাড়া পাহাড়ে-ঘেরা উপত্যকার মধ্যে অন্ধকার রাত্রি সরোবরের বদ্ধ জলের মতো বোবা—তাহার ভাব যেন মনের উপর চাপিয়া বসে। এ রকমভাবে মূঢ়ের মতো জাগিয়া থাকা নিরর্থক মনে করিয়া আবার শুইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম—এ কি! যতদূর মনে পড়িতেছে দিনের বেলায় তো এমন লক্ষ্য করি নাই। দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম—উপত্যকাটা ফাঁকা, গাছপালা বিরল, বন আরম্ভ হইয়াছে পাহাড়গুলার পাদদেশে। এখন মনে হইল উপত্যকা যেন গাছে ভরিয়া গিয়াছে—মাঝখানে সামান্য একটুখানি ফাঁক। এত গাছ আসিল কোথা হইতে? বুঝিলাম রাত্রির অন্ধকার ও স্থানের অপরিচয় দুইয়ে মিলিয়া চোখের ধাঁধা সৃষ্টি করিয়াছে—নতুবা গাছ গজাইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিজলী বাতিটা তুলিয়া লইয়া আলোর পিকচারি ছুঁড়িলাম—যতদূর দেখিলাম উপত্যকা। ফাঁকা কিন্তু যেমন আলো নিভাইয়া দিলাম, অমনি আবার গাছপালার ভিড়ের অনুভূতি হইল। আরো দুই তিনবার আলো জ্বালাইয়া পরীক্ষা করিলাম—ফলাফল পূর্ববৎ। এ কি চোখের মায়া না আর কিছু?

মনে পড়িল গুপ্ত বলিয়াছিল যে এখানকার গাছপালাও জীবিত! কথাটা সত্য হইতে পারে না। কিন্তু সমস্যাটা লইয়া বুদ্ধি আর সংস্কারের মতভেদ দেখা দিল। বুদ্ধি বলে কেমন করিয়া হইবে? সংস্কার বলে —চোখে দেখিতে পাইতেছ না কি? ভাবিলাম জগতের সব রহস্যই কি আমার অবগত। যদি সত্যই গাছপালাগুলি জীবন্ত হয়! তবে তাহাদের আগাইয়া আসা তো অসম্ভব নয়! কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? সারিবদ্ধ শ্রেণীর মতো তাহারা আগাইয়া আসিতেছে কেন? কে তাহাদের লক্ষ্য? আমরা কি? গা-টা ছমছম করিয়া উঠিল? তবে তো এই মাচা-বাঁধা আমগাছটাও জীবন্ত হইতে পারে! সভয়ে একবার এদিক ওদিক চাহিলাম। নাঃ, গাছটা গাছের মতো অচল ও নীরব। তবু ভয় যায় না।

এসব কথা দিনের বেলায় শুনিয়া লোকে হাসিবে, আমিও হাসিয়াছি— সেদিন রাত্রে, সেখানে বসিয়া যে-ভাব মনে উদিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে হাসির মিল নাই। একবার ভাবিলাম গুপ্ত ও প্রকাশকে জাগাই, তারপরে ভাবিলাম বেচারারা ঘুমাইতেছে তাহাদের সুখে ব্যাঘাত করিয়া কি লাভ? মূঢ়ের মতো, সর্পমুগ্ধ হরিণের মতো একদৃষ্টে উপত্যকার দিকে তাকাইয়া জাগিয়া বসিয়া রহিলাম!

বনে যে এতরকম বিচিত্র শব্দ হইতে পারে তাহা জানিতাম না, দিনের বেলায় অন্ততঃ শুনি নাই। কোন শব্দ বা টুং টুং করিয়া ঘণ্টার মতো বাজিতেছে, কোথাও বা একটানা করুণ আওয়াজ; কোন শব্দ বা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো। পরে খোঁজ করিয়া জানিয়াছিলাম ও সব বন্য পাখীর ডাক। হঠাৎ অদূরে গাধার ডাক শোনা গেল। গাধা গৃহপালিত জীব—এখানে আসিবে কিভাবে? ইহার সম্বন্ধেও পরে খোঁজ করিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম যে বুনো হাতীর ডাক অনেকটা গাধার ডাকের মতো শ্রুত হয়। বিচিত্র শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে সমস্ত অরণ্যটাকে সজীব বলিয়া মনে হইল! আবার কেমন বোধ হইল যে সারা বনময় একটা কানাকানি, জানাজানি, উসখুস, ফিসফাস পড়িয়া গিয়াছে, যেন একটা ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ।

আমার মনের একটা অংশ যখন এইসব চিন্তা করিতেছিল তখন আর একটা অংশ ইহার সত্যটা সম্বন্ধে সংশয়পোষণ করিয়া হাসিতেছিল— মনের

মধ্যে দুটা পরস্পরবিরোধী ধারা পাশাপাশি বহিতেছিল সে বিষয়ে আমি ক্ষণে ক্ষণে সচেতন হইয়া উঠিতেছিলাম—আর সেই দোটানার স্রোতে অসহায় আমি তরণীর মতো উৎক্ষিপ্ত হইতেছিলাম! এ এক অভাবিত অভিজ্ঞতা। হঠাৎ গাছের ফাঁক দিয়া উপরের দিকে নজর পড়িতেই দেখিতে পাইলাম শিশিরমার্জিত আকাশে গোটা দুই উজ্জ্বল তারকা জাদুকরের মোহময় চক্ষুর মতো আমার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া আছে। চিরকাল আকাশের তারা আমরা মানবপরিবেশ হইতে দেখিতে অভ্যস্ত, আজ মানবস্পর্শবিমুক্ত প্রকৃতির বুকের কাছে বসিয়া তাহাদের দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম তারা কেবল সুন্দর নয়, ভয়ালও বটে। বটে, তবে এই মোহদৃষ্টি ঐ জাদুকরেরই কাজ? তবে এ সমস্তই ঐ নিশীথিনীরই কাজ!

হে জাদুকরী, এ নিশীথিনী, তোমার অন্ধকারের থলি হইতে জাদুদণ্ড বাহির করিয়া কেন বিশ্বের চোখে বুলাইয়া দিয়াছ জানি না, কিন্তু তাহাতে যে সমস্ত দৃশ্যের, সমস্ত মূল্যের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহা তো প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ পাথরে-গড়া পাহাড় এখন ছায়াসম, ঐ মাটিতে শৃঙ্খলিত অরণ্য সৈন্যবাহিনীর মতো সচল, ঐ পশুপক্ষীর রব এখন সুগভীর ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ, ঐ যে দিবালোকের নিরীহ নীরস জগৎটা এখন মায়াপুরীর উন্মুক্ত বাতায়নের নিকটবর্তী অলিন্দের মতো প্রতিভাত—এ তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি! এই মুহূর্তে ইহার মধ্যে অবিশ্বাসের সূচ্যগ্র বিঁধাইবার স্থানও তো নাই! দিনের বেলায় একথা মনে পড়িয়া হাসি আসিবে—কিন্তু যে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় বসিয়া আছি তাহা তো মিথ্যা নয়।

অরণ্যের চঞ্চলতায় আমার সাময়িক মুগ্ধভাব ভঙ্গ হইল। আবার ঝড় উঠিয়াছে—গাছের ডালপালার আর্তনাদ—অথচ এক ফোঁটা বাতাস গায়ে লাগিতেছে না, এ যেন ছবির ঝড়। এ কোন্ মায়ালোকের ঝড়! কোন্ জাদুজগতের অন্তঃকুহর হইতে এই ঝঞ্ঝা যেন প্রশ্বসিত! আমি এই জাদুজগতের অন্তর্গত নই বলিয়া তাহা আমাকে স্পর্শ করিতেছে না।

এবারে আমাদের গাছটাও মড়মড় করিতেছে—কিন্তু বলাবাহুল্য কোথাও বাতাস নাই। সিগারেট ধরাইলাম। দেশলাইয়ে কাঠি নিস্পন্দ শিখায় জ্বলিল। উপত্যকার বনময় এই যে মাতামাতি এ যেন অন্ধকারকে মন্থন করিয়া কি এক রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা। কি সেই রহস্য?

তাহা যদি জানিতাম তবে প্রকৃতির শেষ কথাটাই হয় তো জানা হইয়া যাইত। সে রহস্য মানুষের জানিবার নয়—কেবল সেই রহস্য-পারাবারের তীরে বসিয়া ঢেউ খাইবার, অনুমান করিবার, শীকরজালে অঙ্কিত রামধনু দেখিবার এবং অতলে তলাইয়া যাইবার অধিকার মানুষের আছে; সে রহস্য জানিবার অধিকার নাই।

প্রকাশ ঠেলিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

প্রকাশ বলিল—খুব ঘুমোলে!

গুপ্ত বলিল—সিগারেটের ছাই এল কোথা থেকে?

আমি বলিলাম—রাতে একবার উঠেছিলাম।

প্রকাশ বলিল—কিছু দেখতে পেলে? গুপ্তের গাছের নড়াচড়া—

সংক্ষেপে বলিলাম—না।

মনে হইল ঐ সিগারেটের ছাই সাক্ষী না থাকিলে রাতের অভিজ্ঞতাকে আমার নিজেরই তো স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত, অন্যে কেন বিশ্বাস করিতে যাইবে। বুঝিলাম যে শেষ রাতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রকাশ অবিশ্বাসে হাসিতে লাগিল; প্রমাণাভাব বশতঃ গুপ্ত চুপ করিয়া রহিল। আমিও নীরব ছিলাম, কিন্তু অন্য কারণে। রাত্রির অভিজ্ঞতাকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে ব্যস্ত ছিলাম, কথা বলিবার অবসর ছিল না।

তিনজনে মাচা হইতে নামিয়া জিপ গাড়ীটার কাছে আসিলাম। গাড়ী পূর্ববৎ রহিয়াছে। এবারে গাড়ীতে চড়িয়া যন্ত্রে দম দিতেই গাড়ী সুবোধ বালকটির মতো নড়িয়া উঠিয়া ছুটিল। রাত্রির অবাধ্যতার লক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিরাপদে আমরা গুপ্তর সরকারী বাসায় আসিয়া পৌছিলাম।

তারপর অনেককাল গিয়াছে, এখনো সে রাত্রির অভিজ্ঞতা বিনা বাতাসে ঝড়ের মতো আমার মনকে মাঝে মাঝে নাড়া দেয়—জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজও তাহাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারি নাই।

কালো পাখী

মিনু হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দেখো বাবা, কি পেয়েছি!

মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখি তাহার হাতে ছোট একটি কালো পাখা; বলিলাম—কোথায় পেলি?

মিনু একবার পাখীটির দিকে, একবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—ধরেছি।

—ধরেছি? সে কিরে! কার পাখী ধরতে গেলি।

মিনুর কেমন যেন সন্দেহ হইল পাখীর স্বত্ব-স্বামিত্বে তাহার পিতার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাই সে বলিল—পাখা আবার কার!

এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময়কার তাহার অর্ধব্যক্ত বাক্য হইতে বুঝিতে পারিলাম যে একটি খাঁচা সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাহার আশু সমস্যার সমাধান হয়।

কাজের চাপে মিনুর পাখীর কথা আমার মন হইতে মুছিয়া গেল।

বিকাল বেলা আমি বাড়ী পৌছিলেই মিনু ছুটিয়া আমার কাছে আসে, তা সে যেখানে—যে অবস্থাতেই থাক না কেন! কিন্তু আজ বাড়ী আসিলাম—মিনু আসিল না। আমি বিস্মিত হইয়া মিনুর মাকে শুধাইলাম, মিনু কোথায়?

মিনুর মা হাসিয়া বলিল—মেয়ের কি আর অন্য দিকে হুঁশ আছে? পাখী নিয়ে পড়ে আছে। তখন আমার সকাল বেলার কথা মনে পড়িল, বলিলাম, চলো, মিনুর পাখী দেখে আসি।

দু'জনে তেতলার ছাদে উঠিয়া দেখিতে পাইলাম যে একান্তে মিনু বসিয়া আছে, সম্মুখে তাহার ছোট একটি লোহার খাঁচা, খাঁচার মধ্যে সেই কালো ছোট পাখীটি। আমাকে দেখিয়া মিনু ছুটিয়া আসিয়া কোলে চড়িল, বলিল, বাবা, পাখাটা কেমন পোষ মেনে গিয়েছে?

তারপরে শুধাইল—বাবা, ওটা কি পাখী?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ভালো করিয়া পাখীটির দিকে তাকাইলাম—সত্যই তো কি পাখী? কোকিলের মতো মিশ কালো অথচ চোখ দুইটা লাল নয়, ময়নার গলার মতো একটা কণ্ঠি আছে তবে রংটা হলদে নয়—লাল, আর আকারে কোকিল ও ময়না, দুইয়ের চেয়েই ছোট, একটা বুলবুলের চেয়ে বড় হইবে না। সত্যই এমন পাখী কখনো দেখি নাই, জানিলাম এ পাহাড়ে দেশে কত অজানা জাতের পাখী আছে—ক'টার আর নাম জানি।

মিনু আবার প্রশ্ন করিল—বাবা, কি পাখী? বলিলাম—ওটা পাহাড়ী ময়না।

মিনু খুশী হইয়া বলিল—ঠিক, ঠিক, ময়নাই বটে!

মিনু কোল হইতে নামিয়া ময়নার পরিচর্যায় লাগিল, আমি অফিসের পোষাক ছাড়িতে গেলাম।

ইহার পর হইতে মিনুর হাবভাবে পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথম, আগের মতো সে আমার কাছে ঘন ঘন আসে না, ডাকিলে তবে আসে, আসিলেও বেশীক্ষণ থাকে না, পাখীর কাছে যাই বলিয়া চলিয়া যায়। দ্বিতীয় পরিবর্তন মিনুর মুখে কথার ঝরণা বহিত। এখন তার কথা বলা কমিয়া গেল। সে চুপ করিয়া আছে কেন শুধাইলে ওষ্ঠাধরে তর্জনী স্থাপন করিয়া বলিত, চুপ। পাখীটা কি কথা বলে? বেশী কথা বল্‌লে পাখী রাগ করবে?

তাহাদের কথা শুনিয়া এতদিনে আমার খেয়াল হইল—সত্যই তো পাখীটাকে কখনো ডাকিতে শুনি নাই তো! মিনুর মাকে শুধাইলে বলিল—সেও কখনো পাখীটাকে ডাকিতে শোনে নাই। তৃতীয় পরিবর্তন, মিনু সঙ্গীদের সাহচর্য পরিত্যাগ করিল, আর সে খেলিতে যাইতে চাহে না, জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলেও তখনি ফিরিয়া আসে, ফিরিয়া আসিয়া পাখীর খাঁচার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, ছাতু ছোলা ফড়িং—যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত থাকে—খাইতে দেয়।

অবশ্য মিনুর এ সব পরিবর্তন তখন তখনই বুঝিতে পারি নাই, অনেক পরে বুঝিয়াছি—হায়, যদি আগে বুঝিতে পারিতাম!

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাংলোর বারান্দায় বসিয়া আছি। চারিদিকে বড় বড় পাহাড়ের মাথাগুলা কালো কালো ছায়া ফেলিয়াছে, নীচের সুগভীর উপত্যকায় মর্মরহীন অরণ্য পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো জমাট, আকাশের মাঝখানে এক ফোঁটা চোখের জলের মতো প্রকাণ্ড একটা তারা, সবসুদ্ধ

মিলিয়া সন্তমৃতের কক্ষের নীরবতা রচনা করিয়াছে। এমন সময়ে দেখিলাম মিনু পা টিপিয়া বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এ সময়ে এখানে আসিবার কথা নয়। আমি শুধাইলাম—মিনু, এখানে কেনরে ?

সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কিছু না বাবা।

বেশ বুঝিলাম সে কোন একটা বিষয় গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া হাতটা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিল—একটা পাখী উড়িয়া গেল।

আমি বলিলাম—মিনু পাখীটা ছেড়ে দিলি নাকি ?

সে বলিল—আবার ফিরে আসবে, বাবা।

তখন তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কথায় কথায় অনেক বিষয় আদায় করিয়া লইলাম। মিনু বলিল যে, সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাখীটা ছেড়ে দেয়, সকালবেলা ফিরে এসে খাঁচায় ঢোকে—ভারি পোষ-মানা পাখী কি না!

আমি শুধালাম—ছেড়ে দিস্ কেন ?

মিনু বলিল—ও দিনের বেলায় কিছু খায় না।

আমি বলিলাম—তবে যে খেতে দিস্ !

সে বলিল—খেতে দিই কিন্তু ও খায় না! একদিন স্বপ্ন দেখলাম যে পাখীটা বলছে, আমাকে সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দিও, সারা রাত ঘুরে খেয়ে সকাল বেলায় ফিরে আসবো। সেই থেকে সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দিই—লক্ষ্মী পাখী, ভোরবেলা ঠিক ফিরে আসে।

বুঝিলাম স্বপ্নের কথা বাজে, তবে পোষ মানিলে পাখী খাঁচায় ফিরিয়া আসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যাই হোক, মিনু যে এর আগেও পাখীটা ছাড়িয়া দিত তাহা আমি বা তার মা কেহই লক্ষ্য করি নাই। আমরা সংসারের বড় কাজেই ব্যস্ত, মিনুর পাখীর তত্ত্ব লইবার অবসর আমাদের কোথায় ? রাত্রিটা পাখীর ও মিনুর আচরণ সম্বন্ধে মনের মধ্যে তোলপাড় করিল—সকাল হইতেই অন্যান্য চিন্তার স্রোতে সব তলাইয়া গেল।

কিছুদিন পরে মিনুর মামা বেড়াইতে আসিল। পাহাড়ী অঞ্চলে তাহার এই প্রথম আগমন। সে মিনুকে দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া বলিল—মিনু, তোর শরীর এত খারাপ হ'য়ে গেল কেনরে ?

মিনু কি আর বলিবে।

তাহার মামা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তোমরা কি লক্ষ্য করনি ?

সত্যই আমরা লক্ষ্য করি নাই। প্রতিদিনের দর্শন নূতন দর্শনের বাধা। এবারে লক্ষ্য করিলাম মিনুর শরীর খারাপ হইয়াছে বই কি! সে কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, মুখ চোখ ফ্যাকাসে, আর উজ্জ্বলতর চোখ দুইটি প্রখরতর দীপ্তিতে তাহার কৃশতাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। মিনুর মামা ডাক্তার আনিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তার পর কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া দেখি মিনু শয্যাতে নাই; বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাহার মাকে আর জাগাইলাম না।—দরজার কাছে গিয়া দেখি দরজা ভেজানো বটে তবে অনর্গল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম বারান্দার একটি খুঁটি ধরিয়া মিনু কালো আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে—সম্মুখে কালো পাহাড় ও বনের ঝাপসা ছায়া। একেবারে গিয়া তাহাকে ধরিলাম, সে চমকিয়া উঠিল, বলিলাম—এখানে কিরে?

সে বলিল,—গোল ক'রো না, তাহলে ও আর ফিরে আসবে না!

—কে?

—পাখীটা।

আমি বলিলাম, না আসে না আসুক, তুই শুতে চল্।

তার পরে বলিলাম—তুই যে একা এসেছিস্ তোর ভয় করে না?

সে বলিল,—ভয় কিসের? ও বলেছে পাহাড়ে বনে ভয়ের কোন কারণ নেই, ঘরেই যত ভয়!

আমি বলিলাম, তোর মাথা! যত সব বাজে বুকনি! এমন করলে ও পাখী ছেড়ে দেবো।

মিনু বলিল,—আমি ছাড়লেও আমাকে ও ছাড়বে না, খুব পোষ মেনেছে কিনা! আমাকে কত কথা শোনায়।

আমি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলাম, পাখী আবার কথা শোনায়? একটা শিসও তো দেয় না।

মিনু বলিল,—মুখে বলে না বটে, কিন্তু স্বপ্নে আমি ওকে দেখি কি না—তখন সব জানতে পাই।

মিনুকে ঘরে টানিয়া আনিলাম। তারপর হইতে দরজায় তালা লাগাইয়া শুইতাম। সে আর বাহির হইতে পারিত না বটে কিন্তু তাহার শরীরও যে কৃশতর হইতেই থাকিল তাহা আমরা লক্ষ্য করিলাম না।

একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া দেখি মিনু বিছানায় জাগিয়া বসিয়া আছে। বলিলাম, মিনু ঘুমোস নি! জেগে কেন রে?

সে বলিল—বাবা, দরজাটা খুলে দাও না! পাখীটা আসতে পারছে না।

আমি বলিলাম, পাখী আবার কোথায় দেখ্‌লি?

সে বলিল, কেন ওই যে জানালার ওধারে—এই বলিয়া কাচের একটা জানালা দেখাইয়া দিল। আমি উঁকি মারিয়া দেখিলাম—কোথাও কিছু নাই। বাহিরে অন্ধকারময় শূন্যতা। তারপরে মিনুকে কাছে টানিয়া লইয়া দুইজনে শুইয়া পড়িলাম।

তার পর দিন মিনুর মাকে গত রাত্রির ও সেদিনকার রাত্রির ঘটনা বলিলাম। সে রাগিয়া মিনুকে এক চড় মারিল এবং পোড়ার-মুখো পাখীটাকে বিদায় করছি বলিয়া খাঁচা হইতে বাহির করিয়া পাখীটাকে ছাড়িয়া দিল। মিনু বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন পাহাড়ে বর্ষা নামিয়াছে। অসাবধানে মিনুর ঠাণ্ডা লাগিল এবং দিনকয়েকের মধ্যেই জ্বর লইয়া সে শয্যাশায়ী হইল। ডাক্তার আসিল, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, শরীর অনেকদিন থেকে খারাপ হচ্ছে, রোগ কঠিন বলেই মনে হচ্ছে। তারপরে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

মিনুর অসুখ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাত্রিবেলা সে ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়া বলিত, বাবা, দরজাটা খুলে দাও না, পাখীটা আসতে পারছে না।

আমরা কখনো পাখী দেখিতে পাইতাম না—তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতাম। দিনের বেলায় সে বড় একটা কথা বলিত না।

ডাক্তার চেষ্টার ত্রুটি করিল না, আমরাও যথাসাধ্য করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মিনু একদিন আমাদের ঘর শূন্য করিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীতে আর মন টেকে না, এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াই, এই পাহাড়ী শহরে প্রতিবেশীর বাড়ী কাছে নয়, বড় যাওয়া হইয়া ওঠে না।

একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মিঃ রায়ের বাড়ীতে গেলাম। মিঃ রায় বলিলেন, আপনার সর্বনাশের কথা শুনেছি, কিন্তু যেতে পারিনি। ক'দিন থেকে আমার ছোট মেয়েটি অসুস্থ।

মিঃ রায়ের ছোট মেয়েটির নাম ঝুমঝুমি, প্রায় মিনুর বয়সী। মাঝে মাঝে মিনুর সঙ্গে খেলিতে আমাদের বাড়ীতে যাইত। রোগীর ঘরে গিয়া দেখিলাম ঝুমঝুমি অত্যন্ত রোগা হইয়া পড়িয়াছে, নিস্তেজের মতো ঘুমাইতেছে। মিঃ রায় বলিলেন, ডাক্তারে দেখছে, বলছে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ভাবিলাম ডাক্তারের ত্রুটিতে রোগী কবে মরিয়াছে? ঘর হইতে দুইজনে বাহির হইয়া পিছনের বারান্দায় গিয়াই আমি চমকাইয়া উঠিলাম, দেখিলাম বারান্দার কাছে একটা খাঁচা—আর তার মধ্যে সেই পাখীটা, কিংবা অবিকল সেইরকম কালো একটা পাখী!

আমি শুধাইলাম, এই পাখীটা পেলেন কোথায়?

রায় বলিলেন,—কি জানি ঝুমঝুমি কোথা থেকে ধরে এনেছে।

বুকের মধ্যে আমার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, পাখীটা আমি ছেড়ে দিই।

রায় বলিলেন, কেন, ওটা যে ঝুমঝুমির খুব আদরের।

আমি বলিলাম, তাহোক। বলা উচিত ছিল সেইজন্যেই ছেড়ে দিতে চাই।

আমি রায়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পাখীটা বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম ওকে ছাড়িয়া দিলেই কি ও ছাড়িবে?

মিঃ রায় আমার অদ্ভুত আচরণের মর্ম বুঝিতে পারিলেন না, আমিও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না। বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

পথে কেবলি মনে হইতে লাগিল, কালো পাখীটার সঙ্গে কোন অজ্ঞেয় সূত্রে নিশ্চয় মিনুর মৃত্যু জড়িত। ভাবিলাম, আমার যা হইবার তো হইয়াছে এবারে মিঃ রায়ের ভাগ্যে না জানি কি ঘটে।

তারপরে অনেকদিন আর রায়ের বাড়ী যাইতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন ম্যালের নিকটে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহার মুখ দেখিয়াই সব বুঝিতে পারিলাম। তিনি আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। দুইজনে চুপ করিয়া অনেকক্ষণ একটি বেঞ্চির উপরে বসিয়া রহিলাম।

মিঃ রায় বলিলেন—আপনি তো পাখীটা ছেড়ে দিয়ে এলেন কিন্তু সেটা আমাদের বাড়ী ছাড়েনি; দিনের বেলা রোগীর ঘরের কাছে এসে উড়ে উড়ে বেড়াতো।

আমি শুধাইলাম, আর রাতের বেলা?

রায় চমকিয়া উঠিয়া শুধাইলেন, রাতের বেলায় যে কিছু হ'ত তা জানলেন কি ক'রে?

আমি আমাদের অভিজ্ঞতা চাপিয়া গিয়া বলিলাম, না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।

রায় বলিলেন, ঝুমঝুমি রাতের বেলায় চীৎকার ক'রে উঠতো—বাবা, দরজাটা খুলে দাও, পাখীটা আসতে পারছে না। কখনো কিছু দেখতে পাই নি। ডাক্তারে বলেছিল ওটা দুর্বল মস্তিষ্কের বিকৃতি।

তারপর রায় বলিলেন, সব চেয়ে আশ্চর্যের এই যে, সব শেষ হ'য়ে যাবার পর থেকে পাখীটাকে আর দেখা যায় নি।

দুইজনে বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। আমার মনের মধ্যে একটা কালো সন্দেহ ক্রমে মূর্তি ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। আর বাহিরের আকাশেও তখন অন্ধকার নিরেট হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় পাহাড়ের চূড়াগুলি পৃথিবীর গায়ে কালো কালো ছায়ার মোটা তুলি বুলাইয়া দিয়াছে, উপত্যকা অরণ্যে চাপা ওষ্ঠাধরের স্বেচ্ছাকৃত নীরবতা, আকাশের তারাগুলিতে কেমন নিষ্পলক জ্যোতি, বায়ুস্তর নিস্তরঙ্গ। ইহারা জানে সব, কেবল বলিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানুষের জীবনমৃত্যু যে রহস্যসূত্রে গ্রথিত, এই পর্বত, অরণ্য, এই গ্রহনক্ষত্র ও তিমিরময়ী রাত্রি—তাদের সমস্ত হিসাব-নিকাশ জানে, কেবল প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের কৃপণ মুষ্টি হইতে সে রহস্য ছিনাইয়া লই এমন সাধ্য আমার নাই। তাই রুদ্ধ রহস্যদ্বারের দিকে তাকাইয়া নিতান্ত মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম।

তান্ত্রিক

জীবনে অনেক বিচিত্র কাজে হাত দিয়াছি, বলা বাহুল্য কোনটাই শেষ করিতে পারি নাই; ভালোই হইয়াছে, নতুবা একটা কাজ লইয়া সারা জীবন পড়িয়া থাকিলে অনেক কাজের অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত থাকিতাম।

প্রথম যৌবনে একবার ভূপর্যটক সাজিয়া বাহির হইয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে সীতারামপুর পর্যন্ত পৌঁছিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে ভূগোলের ক্লাসে পৃথিবীটাকে যত বড় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, পৃথিবীটা তাহার চেয়ে কিছু বড়। অতএব আর কালব্যয় না করিয়া টিকিট কিনিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি ইতিমধ্যে শহরের অর্ধেক লোক খদ্দর ধারণ করিয়া চরকা কাটিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। আমিও খদ্দর ধরিলাম ও চরকা কিনিলাম। এমন সময় এক বন্ধু আসিয়া বলিল, সুতা-কাটা খুবই ভালো, কিন্তু তার চেয়েও ভালো পল্লী-উন্নয়ন। অতএব তাহার সঙ্গে পল্লী-উন্নয়নে লাগিয়া গেলাম অর্থাৎ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতে লাগিলাম। এই সময়ে এক তান্ত্রিকের সঙ্গে জুটিয়া গেলাম এবং রীতিমত রক্তাম্বর, রুদ্রাক্ষমালা এবং একটি প্রমাণ সাইজের নরকপাল সংগ্রহ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার তান্ত্রিক গুরু অকস্মাৎ গাড়ীচাপা পড়িয়া সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিল। তাহার কাছে শুনিয়া-ছিলাম যে পঞ্চকোট পাহাড়ের কাছে এক মহাতান্ত্রিক পুরুষ বাস করেন। আমি তাঁহার সন্ধানে চলিলাম। মুরাডি স্টেশনে নামিয়া পঞ্চকোট যাইতে হয়। একদিন শেষ রাত্রে মুরাডি-স্টেশনে নামিলাম। তখনো অন্ধকার আছে, স্টেশনের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছি, আলো হইলে রওনা হইব, এমন সময়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল, লোকটি যে কাহিনী বিবৃত করিল তাহাই আজ বলিব। আবার বলা বাহুল্য যে তাহার কথা শুনিয়া তান্ত্রিকতার পথ ছাড়িয়া দিয়া হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি শুরু করিলাম। অন্যান্য নূতন এডভেঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি সাইডভিসরূপে

সঙ্গে সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে। ইহার যে কোথায় শেষ জানি না, তবেএ চিকিৎসা-পন্থার সুবিধা এই যে ইহাতে যেমন রুগী সারে না, তেমনি মরেও না; যে সারে আপন ভাগ্যে সারে, যে মরে আপন দুর্ভাগ্যে মরে; ডাক্তার যথাসম্ভব টাকাটা-সিকেটা ও 'হাতযশ' কুড়াইয়া লয়। যাক সে কথা। এখন গল্পটি বলি।

অন্ধকার কাটিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম যে অদূরে আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া একটি লোক তামাক সেবন করিতেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইলাম যে তাহার পরনে রক্তাম্বর, গলায় কয়েক ছড়া ছোট বড় রুদ্রাক্ষ মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক। একবার মনে হইল ইনিই কি তিনি অর্থাৎ পঞ্চকোটের তান্ত্রিক-প্রবর? ভাবিলাম আমার কি এতই সৌভাগ্য হইবে যে দূরের গঙ্গা ঘরের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। পরিচয় আরম্ভ করিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময়ে লোকটি নিজেই আমার কাছে আসিয়া শুধাইল, মশায়ের নাম?

নাম-ধাম বলিলাম।

—এখানে কি জন্যে?

সবিস্তারে বলিলাম, আশা ছিল ইনি তিনি হইলে এখনি ধরা দিবেন।

সমস্ত শুনিয়া লোকটি বলিল—মশায়কে তো বালক বল্‌লেই হয়। ভাবিলাম, বুদ্ধির কথা বলিতেছে নাকি?

আজ্ঞে না, আমার বয়স পঁচিশ।

—তবেই হ'ল, বালক আর কাকে বলে? সংসারে কে কে আছেন?

বলিলাম।

—বিবাহ করেন নি দেখছি।

ঘটক নাকি!

—আমি বলি কি আপনি ঘরে ফিরে যান।

—কেন?

—ও-পথ বড় বিঘ্নসঙ্কুল।

পাহাড়ে পথে হয় তো বাঘ-ভালুকের কথা বলিতেছে। শুধাইলাম, বাঘ-ভলুক আছে?

—না, না, পাহাড়ের পথের কথা বলছি না। বলছি যে তান্ত্রিক সাধনার পথ বড় বিঘ্নসঙ্কুল।

—আপনাকেও যেন—

—হাঁ, আমি একজন তান্ত্রিক। মশায় সেই জন্যই তো আপনাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। ও পথে যাবেন না, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।

—কেন এমন বলছেন ?

—তবে শুনুন। এ বানানো ঘটনা নয়, আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছে, যে মহা সর্বনাশ হয়েছে তাই বলছি। এ কাহিনী শুনবার পরেও আপনার যদি এ পথে যাবার ইচ্ছা হয় যাবেন।

কৌতূহলের বশে বলিলাম, বলুন। তারপরে বেশ চাপিয়া বসিলাম। তিনিও আমার কম্বলের একান্তে বসিলেন। তখন অন্ধকার অনেকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে। দেখিলাম যে লোকটি অত্যন্ত কৃশ, মুখের মধ্যে একটিও দাঁত নাই, নাক ও চোখ দুটিকে বাদ দিলে মুখমণ্ডলের আগাগোড়াই সারি সারি বলি চিহ্নে পূর্ণ। আর এমন উদ্ধত নাসা ও উজ্জ্বল চোখ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। হুঁকো-কল্কে সযত্নে মাটিতে রক্ষা করিয়া লোকটি আরম্ভ করিল :

মানভূম-বাঁকুড়ার যেখানেই যান না কেন মহানন্দ ঠাকুরের নাম শুনতে পাবেন। আমারই নাম মহানন্দ ঠাকুর। আমরা তান্ত্রিক বংশ। বাল্যকালে পিতার কাছে শাস্ত্র পাঠ করেছিলাম, তারপরে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মও শিখেছিলাম তাঁর কাছে। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের আয়ে আমাদের সাংসারিক সচ্ছলতা ছিল, ঐ ক'রেই পিতা কিছু জমি-জমাও কিনেছিলেন। তারপরে তিনি গত হ'লে আমিও ঐভাবে সংসার চালাতে লাগলাম। যথাসময়ে বিবাহ করলাম এবং ক্রমে সন্তানাদিও হ'ল। ইতিমধ্যে একজন অভিজ্ঞ ক্রিয়াবান তান্ত্রিক বলে দেশের মধ্যে আমার নাম ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমে অন্য জেলা থেকেও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করবার জন্যে ডাক আসতে লাগলো। এমন কি কখনো কখনো ধনী ব্যক্তিদের আগ্রহে কলকাতায় তাঁদের বাড়ীতে গিয়েও ক্রিয়াকর্ম করতে হয়েছে। দু'জন উপযুক্ত চেলাও জুটে গিয়েছিল। যাক্, ও-সমস্ত কাহিনী এখন থাক।

—কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে নিষেধ করছেন কেন? আপনার যদি এত বাড়বাড়ন্ত হ'য়ে থাকে, আমারই বা হবে না কেন ?

—অতি বাড় ভালো নয় বাবা, ওতেই তো পতন হ'ল। সেই ঘটনাই বলতে বসেছি, বাড়বাড়ন্তের কথা নয়।

এখন আমার বয়স ষষ্টি পূর্ণ হয়েছে। প্রায় কুড়ি বৎসর আগেকার কথা বলছি। সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। ভোরবেলা উঠে দাওয়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জানালেন যে তাঁর মনিবের বাড়ীতে একটা স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, আমার নাম তাঁর মনিব এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছেন, আমাকে কলকাতায় যেতে হবে।

আপত্তি করবার কিছু ছিল না, একদিকে প্রচুর অর্থ পাবার আশা, অন্যদিকে অজন্মার জন্য সে-বছর খরচের টানাটানি।

গৃহিণী শুনে বললেন, যাও না, তবে তাড়াতাড়ি ফিরো।

ছেলে দুটি এবং মেয়ে তিনটি কলকাতা যাচ্ছি শুনে কার কি চাই একটা ফর্দ ক'রে আমার হাতে দিলে। মহেন্দ্র আর অনাদি নামে দু'জন চেলাকে নিয়ে সেদিন রাত্রে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কলকাতা যাত্রা করলাম।

কলকাতায় এসে ঐ ভদ্রলোকের মনিবের সঙ্গে আলাপ হ'ল। যেমন ধনী, তেমনি সজ্জন, বয়স ষাটের উপরে, নাম যদুপতিবাবু।

যদুপতিবাবু বললেন যে বছর দশেক আগে তিনি গিরিডিতে একটি বাড়ী কিনেছিলেন। বাড়ীটি কিনবার পর থেকেই তাঁর পরিবারে ঘন ঘন মৃত্যু হ'তে আরম্ভ করলো।

আমি শুধোলাম গিরিডির বাড়ী ক্রয়ের সঙ্গে মৃত্যুর যোগাযোগ বুঝলেন কি ক'রে?

তিনি বল্‌লেন, প্রথমে তো বুঝতে পারিনি, ক্রমে পেরেছি।

—কেমন ক'রে?

—সব বলছি, শুনুন।

—আচ্ছা, মৃত্যু কি গিরিডির বাড়ীতে হয়েছে?

—না, সমস্ত মৃত্যুই কলকাতায় ঘটেছে।

—মৃতেরা কি কখনো গিরিডির বাড়িতে গিয়েছিলেন?

—ছুটি-ছাটায় দু'দশ দিনের জন্য গিয়েছে। স্থায়ীভাবে কখনো থাকেনি।

—স্থায়ীভাবে কে থাকেন ওখানে?

—স্থায়ীভাবে বলতে গেলে থাকি আমি আর আমার স্ত্রী। আমরা স্বামী-স্ত্রী স্থায়ীভাবে ওখানে থাকবার উদ্দেশ্যেই বাড়ীটা কিনি আর কিনে দুটো নূতন মহল তৈরী ক'রে নিই। কিন্তু—

বলে তিনি কপালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, প্রথমে গেলেন আমার ভাই আর ভ্রাতৃবধূ। আমরা একান্নভুক্ত ছিলাম। তারপরে আমার অবিবাহিতা কন্যা দুটি গেল। তারপরে গেলেন পুত্রবধূ, তারপরে পুত্র, ঐ একটিই ছিল আমার।

—এখন আপনাদের সংসারে কে কে আছেন?

—আমি, গৃহিণী আর একটি নাতি—ঐ পুত্রটির পুত্র।

—আচ্ছা এবারে বলুন, ঐ বাড়ী কেনা আর মৃত্যুর মধ্যে যোগাযোগের সন্দেহ কেন হ'ল?

—সবগুলি মৃত্যুই অবশ্য রোগে হয়েছে, কাজেই সন্দেহ করবার কারণ হয়নি। কিন্তু শেষ দু'জনের অর্থাৎ আমার পুত্রবধূর ও পুত্রের মৃত্যুর আগে, রোগে পড়া আর মৃত্যুর মধ্যে বেশী সময় পাওয়া যায় না, একবার ক'রে মহাপুরুষ সাক্ষাৎ দিয়েছেন।

—মহাপুরুষ?

—হাঁ।

—কোথায়?

—গিরিডির বাড়ীতে। বোধ করি বাড়ীটা তাঁর আশ্রয়, আমরা কেনাতে তিনি বিরক্ত হয়েছেন।

—বাড়ীটা বেচে দেন না কেন?

—বেচবার চেষ্টা করেছি, কেউ কেনে না। দান করবার চেষ্টা করেছি, কেউ নেয় না। আমার দুর্ভাগ্যের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে কিনা। কি বলবো ঠাকুর, বাড়ীটা আঠার মতো আমার হাতে আটকে থেকে আমার সর্বনাশ করছে। এখন শিবরাত্রির সলতে ঐ নাতিটি মাত্র আছে—তাকে বাঁচাও ঠাকুর।

এই বলে তিনি আমার পা জড়িয়ে ধরলেন।

আমি বললাম—করেন কি, করেন কি, ওতে যে আমার পাপ হবে।

আরও বললাম, মহাপুরুষকে খুব শক্তিশালী মনে হচ্ছে, তাই কাজটি খুব শক্ত, খরচ-পত্র হবে।

—হোক্, হোক্ আপনি আয়োজন করুন।

তারপর দিন-পনেরো কলকাতার বাজারে এবং নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে স্বস্ত্যয়নের সমস্ত উপকরণাদি সংগ্রহ করলাম, টাকার অভাব ছিল না, তাই কোন ত্রুটি রাখলাম না।

সমস্ত সংগ্রহ শেষ হ'লে যদুপতিবাবুকে বললাম, এবারে আমাদের গিরিডি যাত্রা করতে হবে, সঙ্গে আপনি আর আপনার স্ত্রী যাবেন।

—নাতিটি?

—সে এখানে থাকবে।

তারপরে একদিন নাতিটির বুকে শাস্ত্রোক্ত একটি কবচ পরিয়ে দিয়ে আমরা সকলে গিরিডি যাত্রা করলাম।

মহানন্দ ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—

সন্ধ্যার আগেই আমরা গিরিডিতে এসে পৌছলাম। যদুপতিবাবুর মস্ত বাড়ী। তিনি আমাদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীটা দেখালেন। একটা পুরাতন মহল। যদুপতিবাবু বললেন, এটা তিনি কিনেছিলেন আর দুটো মহল তৈরী করেছেন—নূতন ও পুরাতন মহলের মস্ত একটা উঠোন, অনেকরকম ফুল গাছ—আর মস্ত একটা বেল গাছ।

আমাদের থাকবার জায়গা পুরানো মহলটার নীচের ঘরে হ'ল আমরা সেখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে যদুপতিবাবু এলেন। তখন আবার স্বস্ত্যয়নের কথাবার্তা শুরু হ'ল—বাইরে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। এমন সময় একজন বুড়ো লোক খড়ম পায়ে দিয়ে বিনা নোটিশে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, তাঁর গা খালি, খাটো ধুতি পরনে কাঁধের উপর একখানি গামছা, তিনি সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন

—তোমরা এখানে কেন এসেছ?

আমি কারণ বললাম।

তিনি বললেন—পারবে?

—চেষ্টা ক'রে দেখি।

—আচ্ছা, দেখো।

তারপরে মহেন্দ্র ও অনাদির দিকে তাকিয়ে শুধালেন—তোমরা এর মধ্যে কেন? মারা পড়বে যে!

মহেন্দ্র বলল—এই তো আমাদের পেশা!

—পেশা? বটে! এখনি পালাও, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।

তারপরে তিনি অনাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন বাপু মারা পড়বে! তোমার বাড়ী রাণীপুকুরে, কি বলো?

—আজ্ঞা হাঁ।

আবার মহেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমার বাড়ী বামুনদাঁড়া গাঁয়ে? এখনি সরে পড়ো।

আর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, দুটো বামুনের ছেলে মারবার জন্যে নিয়ে এসেছ? তোমার আর কি? আচ্ছা, দেখা যাবে কেমন স্বস্ত্যয়ন করতে পারো?

এই বলে আবার বিনা নোটিশে যেমন এসেছিলেন তেমন চলে গেলেন।

আমি ভাবলাম লোকটা পাড়ার কোন মাথা-পাগলা বুড়ো হবে, যারা সব কাজে বিনা প্রার্থনায় উপদেশ দিয়ে থাকে। যদুপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—লোকটা কে? কিন্তু দেখি যে তিনি কাঠের পুতুলের মতো তার প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে নিষ্পলকভাবে বসে আছেন! আবার শুধোলাম—মশায় লোকটা কে?

যদুপতিবাবু শুষ্ককণ্ঠে বললেন—ইনিই তিনি!

—কে?

—সেই মহাপুরুষ—যাঁর কথা আপনাকে পরে বলবো বলেছিলাম।

—চিনলেন কি ক'রে?

আমার পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যুর আগে দু'বার দেখা দিয়েছিলেন?

—কোথায়?

—ঠিক এই ঘরে—এইরকম সন্ধ্যাবেলায়।

এবার মহানন্দ ঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—মশায়, আমি অনেক ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য দেখেছি—কিন্তু ঠিক এরকম প্রত্যক্ষভাবে কিছু দেখিনি! মহাপুরুষ যিনিই হোন, এরকম শক্তিশালী ব্রহ্মদৈত্য আগে দেখিনি, বুঝলাম এবার খুব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে এসেছি।

অনাদি বেঁকে বসলো, বললো—মশায়, আমি এর মধ্যে নেই। দেখলেন না উনি সর্বজ্ঞ পুরুষ?

—আহা, তোমার ভয় কি?

—ভরসাই বা কি? না মশায়, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। আমি এর মধ্যে নেই।

আমি বললাম—তোমরা নিশ্চয় জেনো, ক্ষতি হ'লে আমার হবে। তোমরা আমার সঙ্গে এসেছ, তোমাদের দোষ কি?

—কই, আপনাকে তো কিছু বল্‌লেন না?

—আমাকে কৃতনিশ্চয় জেনেছেন, তাই বলা বাহুল্য মনে করলেন। কিন্তু অনাদি কিছুতেই রাজী হ'ল না, অবশ্য মহেন্দ্র বলল যে সে আমার সাহায্য করবে, ক্ষতি হ'লে আর কি করা যায়?

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পুরাতন মহলের প্রশস্ত একটি কক্ষে আমরা অর্থাৎ আমি ও মহেন্দ্র স্বস্ত্যয়নে বসলাম। যদুপতিবাবু আর তাঁর গৃহিণী দু'জনে একদিকে বসলেন। সারারাত্রি স্বস্ত্যয়ন চলবে—শেষ রাত্রে পূর্ণাহুতি। এমন তিন রাত্রি চলবে।

প্রথম রাত্রে আর কোন বাধা সৃষ্টি হ'ল না, কেবল পাশের ঘরে সারারাত্রি একজোড়া খড়মের খটখট শব্দ উঠ্‌তে লাগলো, যেন কে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে। কে বেড়াচ্ছে সবাই বুঝতে পারলো। শেষ রাত্রে যথারীতি পূর্ণাহুতি হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় রাত্রির স্বস্ত্যয়নও অনুরূপ অবস্থায় সম্পন্ন হ'য়ে গেল। তৃতীয় দিন রাত্রে আবার যথাসময়ে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হ'ল। আজকে অনাদি কি ভেবে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। এ ঘরে স্বস্ত্যয়ন চলছে—আর পাশের ঘরে খড়মের সেই পায়চারির শব্দ!

স্বস্ত্যয়ন শেষ ক'রে পূর্ণাহুতি দেবার আয়োজন করছি, এমন সময়ে অদূরে এক বিকট শব্দ শ্রুত হ'ল। প্রাচীনকালে ডাকাতরা যেমন আওয়াজ ক'রে বাড়ীর উপর চড়াও হ'ত—সেইরকম শব্দ। শব্দ ক্রমে নিকটতর হ'তে লাগলো। যদুপতিবাবু ও তাঁর গৃহিণী ভয়ে তটস্থ, মহেন্দ্র আর অনাদিরও প্রায় সেই অবস্থা। আমি অভয় দিয়ে বললাম, যা-ই দেখুন না কেন, আপনারা ভয় পাবেন না বা আসন ত্যাগ করবেন না, তা হ'লেই বিপদ ঘটবে।

শব্দ এবারে বাড়ীর কাছে এসে পৌঁচেছে। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই চারজন বিরাটকায় পুরুষ ঘরে প্রবেশ করলো। তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কেবল পায়ে খড়ম আর গলায় আর বাহুতে রুদ্রাক্ষের ডোর—আর প্রত্যেকের হাতে প্রকাণ্ড একটি নরকপাল।

তারা আমার কাছে এসে নরকপাল পেতে দাঁড়ালো। আমি নরকপাল পূর্ণ ক'রে কারণ-বারি ভরে দিতে লাগলাম। প্রচুর কারণ-বারির আয়োজন ছিল, যদুপতিবাবু খরচের কার্পণ্য করেননি। তারা প্রত্যেকে আট দশ বার বারি পান ক'রে সেইরকম বিকট ধ্বনি করতে করতে প্রস্থান করলো।

ওরা আসবার আগেই পূর্ণাহুতি দান হ'য়ে গিয়েছিলো। কান পেতে শুনলাম পাশের ঘরে খড়মের আওয়াজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। মনটা খুশী হ'ল।

পরদিন ভোরবেলা আমি যদুপতিবাবুকে বললাম, আপনাদের বিঘ্ন কেটে গেল।

তিনি শুধোলেন, বুঝলেন কি ভাবে ?

—ঐ যে ওঁরা এসে কারণ-বারি পান করলেন, ওটাই সার্থক স্বস্ত্যয়নের চিহ্ন।

—ওঁরা কে ? প্রেতযোনি ?

—না, ওঁরা ভৈরব। বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে থাকেন, তান্ত্রিক ক্রিয়ার সংবাদ পেলে আসেন।

—সংবাদ পাবেন কি ক'রে ?

—তা নইলে আর ভৈরব কেন ? মন্ত্রশক্তির বলে ওঁরা জানতে পারেন।

—কিন্তু কাছাকাছি তো কোথাও পাহাড়-পর্বত নেই।

—কেন হিমালয় ?

যদুপতিবাবু ভাবলেন যে আমি পরিহাস করছি।

—পরিহাস নয়। সাধনার বলে ওরা মনোরথ গতি লাভ করেছেন। যেমন অনায়াসে দূরের সংবাদ জানতে পারেন, তেমনি মনোরথ বেগে চলাচল করতে পারেন।

—কই, স্বস্ত্যয়নের সফলতা সম্বন্ধে ওঁরা কিছু বললেন না তো ?

—ওঁরা যার-তার সঙ্গে কথা বলেন না। কিন্তু ওঁরা যে এলেন আর কারণ-বারি পান ক'রে সন্তুষ্ট হলেন, এ থেকেই বুঝে নিতে হবে।

—সন্তুষ্ট না হ'লে ?

—সর্বনাশ! তৃপ্তিমতো কারণ-বারি না পেলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড ক'রে দিতেন, কাউকে আর জীবিত থাকতে হ'ত না।

তারপর বললাম, যাক্, আপনি নিশ্চিন্তে এবার এ বাড়ীতে বাস করুন, আপনার নাতির সমস্ত ফাঁড়া কেটে গেল।

পরে, অনেকদিন পরে, যদুপতিবাবুর কাছ থেকে তাঁর নাতির বিবাহের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। এতদিনে বোধহয় যদুপতিবাবু গত হয়েছেন, এসব অনেকদিনের কথা হ'ল।

সেইদিনেই আমরা তিনজনে বাঁকুড়া অভিমুখে যাত্রা করলাম।

মহেন্দ্র আর অনাদি কলকাতা হ'য়ে গেল, আমি ভোর রাত্রের ট্রেনে ঝাঁটিপাহাড় স্টেশনে এসে নামলাম। আগেই লিখে দিয়েছিলাম স্টেশনে যেন একজন লোক আর গরুর গাড়ী আসে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি আমার পুরানো চাকর গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে পায়ের উপর পড়লো, কর্তা, আর কি করতে বাড়ী যাবেন?

বুঝলাম মহাপুরুষ আমার সর্বনাশ না ক'রে ছাড়েননি। শুনলাম দুদিন আগে স্বস্ত্যয়নের শেষরাত্রে আমার স্ত্রী-পুত্র সব ওলাউঠায় মারা গিয়েছে।

তখনি ফিরলাম, বাড়ী আর গেলাম না। মহাপুরুষকে গৃহছাড়া করেছিলাম, তিনিও আমাকে গৃহছাড়া ক'রে তবে ছাড়লেন। সেই থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াই—এমনি ক'রে কুড়ি বছর হ'য়ে গেল। আরও কতদিন ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে!

মহানন্দ ঠাকুর থামিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তামাক সাজিয়া লইলেন এবং তাহা যথারীতি সেবন করিতে করিতে বলিলেন, তাই বলছিলাম বাবা, ও-পথে যেও না। ও সকলের সয় না। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ যারা ক'রে থাকে, তাদের প্রায় সকলেরই আমার মতো দশা হ'য়ে থাকে। তোমার এখনো ফিরবার পথ আছে, ফিরে যাও, বুড়োর কথা শোনো।

ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। প্রথমতঃ মহাপুরুষ ও ভৈরব দেখিবার তেমন আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সংসারে এডভেঞ্চারের পথ তো একটি মাত্র নয়, পথান্তর বাছিয়া লইলেই চলিতে পারে। বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। এখন এডভেঞ্চারের নূতন পথ ধরিয়াছি—পাঠ্যপুস্তক লিখিতেছি এবং নিত্য নূতন মহাপুরুষের পরিচয় পাইতেছি। আরও দেখিতেছি যে এ পথের ভৈরবগণও নরকপাল পূর্ণ করিয়া কারণ-বারি না পাইলে এমন সব লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে যে সে কি আর বলিব।

অশরীরী

অল্প দিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি মৃত্যুতে আমাদের বাড়ীতে একটি অনৈসর্গিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল।

প্রথমে মারা গেল বাড়ীর একটি ছোট ছেলে, খেলা করিবার সময় ছাদ হইতে পড়িয়া। সেই ঘটনায় বালকের মাতা এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে. সে শয্যাগ্রহণ করিল। সেই শয্যা আর সে ছাড়িল না। মৃত্যু আসিয়া শোকাতুরার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে দেড় মাস কালেরও ব্যবধান নয়। তৃতীয় মৃত্যুটি [illegible] আকস্মিক। তখন বর্ষাকাল। বিদ্যুতের তারে কোথায় ত্রুটি [illegible], কেহ জানিত না। বাড়ীর একটি বয়স্ক বালক সুইচ টিপিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। সেই ঘরটিতে অপর কেহ ছিল না, কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার অবকাশও পাইল না। চতুর্থ বা শেষ মৃত্যুটি ঘটিল বাড়ীর একটি চাকরের। অনেক দিনের পুরানো চাকর, আমাদের পরিবারের স্বাঙ্গীভূতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় সুস্থ শরীরে সে শুইয়াছিল, ভোরবেলায় দেখা গেল তাহার দেহ প্রাণহীন। ডাক্তার আসিল, পরীক্ষা করিয়া বলিল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। আমরা বলিলাম, লোকটির তো হার্টফেল করিয়া মরিবার বয়স হয় নাই। ডাক্তার বলিল, আর সবেরই বয়স আছে, মরিবার বয়স নাই। অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া এমন আর কে বলিতে পারিত।

তিন চার মাসের মধ্যে এই চারিটি মৃত্যু বাড়ীতে ঘটিল। পরিবারের বালকবালিকা হইতে বয়স্কগণ অবধি সকলেই ভাঙিয়া পড়িল কিন্তু শোক যতই তীব্র ও ব্যাপক হোক না কেন সংসার তাহার প্রাত্যহিক দাবি ছাড়ে না, সেই দাবি মিটাইবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া শক্ত থাকিতে হইল। শোক করিবার অবকাশ আমার ছিল না।

সংসারে প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিতান্ত অভ্যাসের তাগিদেই আপনার চিহ্নিত পথে চলিতে লাগিল। সকাল হয়, চাকর বাজারে যায়, যথাসময়ে আহারের ডাক পড়ে, অফিসগামীরা অফিসে যায়, এইভাবে সবই চলিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে আনন্দ নাই, জীবনে উৎসাহ নাই, এমন কি সবাই যেন স্বল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছে। কেহ অপরের মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে সাহস করে না, কি জানি দুই দৃষ্টির ঠোকাঠুকিতে সুপ্ত শোকের আগুন যদি জ্বলিয়া ওঠে!

আরও একটা ভীষণতর সম্ভাবনা ছিল। 'এবার কার পালা?' এই আশঙ্কা প্রত্যেকের মনেই গুপ্ত ছিল—হঠাৎ যদি চোখে চোখে ঠেকিয়া কথাটা প্রশ্নরূপে ঝলকিয়া ওঠে, তাই সকলে পরস্পরের চোখ এড়াইয়া চলিত। আর এতবড় বাড়ীটা কেমন যেন অদ্ভুতরকম নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে যে কথাবার্তা বলিত না, কিংবা বিশেষ করিয়া ধীরপদেই চলিত এমন বলি না—কিন্তু কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ মনে হইতে যেন অনেকটা দূর হইতে আসিতেছে, মনে হইত সিঁড়ির উপরে কে যেন অদৃশ্য পা পাতিয়া রাখিয়াছে—নতুবা ওঠানামার শব্দ এত ক্ষীণ কেন?

এই সময়ে একদিন একজন পশ্চিমা চাকর নিযুক্ত হইল। হঠাৎ রাত্রিবেলা তাহার আর্তস্বর শুনিয়া সকলে নিচের তলায় ছুটিয়া গেলাম, কি ব্যাপার! দেখিলাম যে লোকটা জাগিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। 'কি হয়েছে রে?' সে কেবল একটি কথা বলিল, "দেও"। এই বলিয়া সে জানালার বাহিরের কালো বকুল গাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। দেখিলাম যে, বাহিরের দিকে অন্ধকারের মধ্যে বকুল গাছটা একটা সুবৃহৎ তোড়া-বাঁধা অন্ধকারের মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে 'দেও' অর্থাৎ ভূতটুত কিছু নয়, হঠাৎ ঐ গাছটা দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে চায় না। সে বলে দেও' একটা নয়, দুইটা। একটা লেড়কা, আর একটা আওরং জানালার দিকে মুখ করিয়া ঐ গাছটার তলায় দাঁড়াইয়াছিল।

আমি বলিলাম—তাহারা 'দেও' নয়, সত্যকার মানুষ।

সে মানিবে কেন? পাছে আরও কিছু বলিয়া ফেলে, তাই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া তাহাকে উপরতলায় লইয়া গিয়া আমার ঘরের বারান্দায়

শুইতে বলিলাম। ভোরবেলা উঠিয়া সে একটা পশ্চিমা ধরনের সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল, বলিল যে, এ বাড়ীতে 'দেও' আছে।

এই ঘটনায় সকলের মনের শোকের সহিত ভয়ের যোগ হইল। আমি সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, বেটার পালাইবার ইচ্ছা ছিল, তাই ভূতের একটা অবতারণা করিল। কিন্তু মুশকিল এই যে, কেহ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক অবধি করে না, করিলে আমার যুক্তির স্বপক্ষে দু-চার কথা বলিবার অবকাশ পাইতাম। আমার কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া থাকে, বেশ বুঝিতে পারি, সকলেই মনের ভিতরে শোক ও ভয়কে এক শয্যায় সযত্নে লালন করিতেছে। আমি বুঝিলাম, সকলের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হইবার মুখে, অতঃপর দৈহিক স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িবে। তখন আমি একদিন প্রস্তাব করিলাম যে, কিছুদিনের জন্য সকলে একবার শিমুলতলা ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়। কেহ উৎসাহ প্রকাশ না করিলেও আপত্তি করিল না। শিমুলতলায় আমাদের একটি বাড়ী ছিল। কয়েকদিন পরে আমি সকলকে লইয়া গিয়া শিমুলতলায় রাখিয়া আসিলাম। কলিকাতার বাড়ীতে আমি একা থাকিলাম, আর থাকিল একটা নূতন চাকর। সে পূর্বেতিহাসের কিছুই জানিত না।

শিমুলতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি অসুখে পড়িলাম। অসুখ এমন কিছু নয়, প্রথমটা কিছুদিন সর্দিজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া চালাইলাম। কিন্তু আট দশ দিন পরেও শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে ডাক্তারকে কল দিলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোন বিশেষ রোগের লক্ষণ মিলিতেছে না, 'নার্ভাস শক' বলিয়া মনে হইতেছে। 'নার্ভাস শক' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, দেহের স্নায়ু-পুঞ্জের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়াছে, তাই তাহারা সাময়িকভাবে বিকল হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। তারপরে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই—কিছুদিন শুইয়া থাকুন, সব সারিয়া যাইবে। ডাক্তার বিদায় হইলে ভাবিলাম, ডাক্তারের কথা মিথ্যা নয়—এ কয়মাস আমাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। মৃত্যুশোকে আর সকলে যখন কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আমার বিশ্রামের সময় ছিল না, এমন কি একটু নিরিবিলি বসিয়া একবার যে অশ্রুপাত করিব, সে অবসরটুকুও পাই নাই। বুঝিলাম যে, ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষোভ জমিয়া

উঠিতেছিল, তখন প্রকাশের সময় ছিল না, এখন অবসর পাইয়া স্নায়ুপুঞ্জ এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারে বলিয়াছে, কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ এ রোগের কোন ঔষধ নাই, শুইয়া থাকাই একমাত্র চিকিৎসা, তাই শুইয়া থাকিলাম, অবশ্য উঠিবার শক্তি ছিল না—ইচ্ছাও বড় ছিল না।

সারাদিন একাকী শুইয়া থাকি, সারাদিন এবং সারারাত। চাকরটা নিয়মিত সময়ে আসিয়া খাদ্য ও পথ্য দিয়া যায়, অন্য সময়ে তাহার বড় দেখা পাই না, তবে পদশব্দে ও গার্হস্থ্য কাজের টুকটাক আওয়াজে বুঝিতে পারি যে, লোকটা নিচের তলাতেই আছে। আমাদের বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়, তিনতলা, চকমিলানো ধরনের সেকেলে বাড়ী। ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারি অনেকগুলি কক্ষ বাড়ীটিতে; এখন দু'তিনটি ছাড়া সব তালাবন্ধ, সকলে থাকিবার সময়েও সবগুলি খুলিবার প্রয়োজন হয় না।

দোতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে একদিকে আমার শয্যা, শুইয়া থাকিলে বাহিরের পথের লোক চলাচলের কতক চোখে পড়ে, রাত্রিবেলায় গ্যাসের আলোক কতক ঘরে আসিয়া ঢোকে আর বসন্ত ও বর্ষাকালে যথাক্রমে দক্ষিণ ও পূবের জানালা দিয়া হু হু করিয়া বাতাস প্রবেশ করে। আমি অনেকগুলি বালিশ মাথায় দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া পড়িয়া থাকি; ক্লান্তি যতই বাড়ে—একটি করিয়া বালিশ সরাইয়া ফেলি, শেষ একটি বালিশ যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন বিছানার উপর গড়াইতে থাকি,—গড়াইতে গড়াইতে কখন ঘুমাইয়া পড়ি। এইভাবে রাত্রি কাটিয়া যায়। আর দিন? দিনের বেলায় জাগিয়া ভাবিয়া এবং লঘুধরনের বই পড়িতে চেষ্টা করিয়া কাটাই, পথের আনাগোনা দেখি আর জানালা দিয়া বকুল গাছটার পাতায় আলোর চিকিমিকি দেখি ও পাখিগুলার কিচিমিচি শুনি। মাঝে মাঝে চাকরটা আসিয়া পথ্য খাদ্য ও ডাকের চিঠি দিয়া যায়।

সেদিনটার কথা, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলা উচিত—সে রাতটার কথা কখনও কি ভুলিতে পারিব! আজ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া সকল কথাই বলিতে পারিতেছি। সে দিনের অভিজ্ঞতাকে এখন অপরের অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু কখনও ভাবি নাই "তাহার" হাত হইতে মুক্তি পাইব। অনেকে আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া বলিয়াছে, ওটা "নার্ভাস শকের" প্রতিক্রিয়া, আসলে কিছুই নয়।

নার্ভাস শক। ডাক্তার এই যে কথাটা বলিয়াছিল লোকে তাহার বেশী আর অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু আমি তো জানি, আমার অভিজ্ঞতায়, "তাহার প্রভাব" কতখানি সত্য,—কত মর্মান্তিকভাবে সত্য। লোকে যখন 'নার্ভাস শক' বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, আমি তর্ক করি না চুপ করিয়া থাকি কিংবা বড় দুঃখে হাসি আর ভাবি—একজনের অভিজ্ঞতা অপর একজনকে বুঝানো কত কষ্ট।

সেই প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতাকে "তাহার আবির্ভাবের" সূত্রপাত বলিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই, আদ্যন্ত ইতিহাস মিলাইয়া লইয়া আজ বুঝিতেছি এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার পরেও শিহরিয়া উঠিতেছি, ভাবিতেছি—মৃত্যুর কত নিকটেই না গিয়া পড়িয়াছিলাম!

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া জানালার দিকে নজর পড়িবামাত্র বুকের রক্ত একবারের জন্য ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়া যেন জমিয়া কঠিন হইয়া গেল। দেখিলাম জানালার ঠিক বাহিরেই অতিকায় একটি মস্তক। ভাবিলাম, স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু চোখে হাত দিয়া বুঝিলাম চোখের পাতা খোলা, গায়ে চিমটা কাটিয়া দেখিলাম—লাগিতেছে। সন্দেহ মাত্র আর রহিল না যে, আমি জাগ্রত। ভয়ে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম—স্বর বাহির হইল না; ঘরের আলো জ্বালিবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু উঠিতে পারিলাম না—এ যেন অপরের শরীর! কালো প্রকাণ্ড মস্তক! নাক চোখ মুখগুলা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু মস্তক যে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওদিকে চাহিয়া থাকা কঠিন, না থাকা আরও কঠিন। সেই শীতের রাত্রে কপালে ঘাম গড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন বন্ধ হইবার মুখে—ঠিক সেই সময়ে একখানা মোটর গাড়ী পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাতি হইতে এক ঝলক আলো মুণ্ডটার উপরে পড়িল। মুণ্ড কোথায়? সেই ঝাঁকড়া বকুলগাছটা যে! আবার বুকের রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হইল! মনে মনে হাসিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তখনই মনে পড়িল যে, এ কেমন ভ্রান্তি। যে বকুল গাছটাকে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর দেখিতেছি, তাহাকে কেন হঠাৎ অতিকায় মস্তক বলিয়া মনে হইল! তখনই আবার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল,—নার্ভাস শক। পুস্তকে পড়িয়াছি বটে যে, নার্ভাস শকের ফলে কত সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়! যাই হোক গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, জল

খাইবার জন্ম উঠিলাম। টেবিলের উপরে এক গ্লাস জল ঢাকা থাকে। ঢাকা খুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। জল খাইল কে? আমিই কি আগে আর একবার উঠিয়া জল পান করিয়াছি? কই, মনে তো পড়ে না! চাকরটার উপরে রাগ হইল, ব্যাটা ফাঁকি দিতে শুরু করিয়াছে। জল পান আর হইল না, ঘরে আর জল ছিল না। শুইয়া পড়িলাম এবং ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া অনেকে শুধাইয়াছে—কিছু দেখিয়াছ কি? স্বীকার করিতে হয় যে, কিছু বা কাহাকেও দেখি নাই। লোকে হাসে, তাহাদের নার্ভাস শকের থিওরীটা আরও পাকা হয়! কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, কিছু না দেখার চেয়ে কিছু দেখা অনেক ভালো। শরীরীর সহিত বোঝাপড়া চলে—কিন্তু অশরীরীর সহিত তেমন হইবার নয় বলিয়াই তাহা ভয়ঙ্কর। এখন হইতে আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, শত্রুকে 'অশরীরী' বলিয়া উল্লেখ করিব।

পরদিন রাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল—দেয়াল-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি দেড়টা। তখনই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, সেই কালো মাথাটা নাই তো? আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম বকুলগাছটার পাতাগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে। স্বস্তি বোধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভীরুতার প্রতি একপ্রকার ধিক্‌কার বোধ হইল। তৃষ্ণা পাইয়াছিল—জল পান করিবার জন্য উঠিলাম, গেলাসের ঢাকনা তুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। কাল বকুলগাছটাকে কালো মাথা কল্পনা করিবার ফলে মনে হইয়াছিল যে, অশরীরী জল পান করিয়া গিয়াছে। আজ ভয়ের সেই পরিপ্রেক্ষিত ছিল না, মনে হইল চাকরটাই ফাঁকি দিয়াছে। শাসন করিয়া দিবার অজুহাতে (আসল কথা নিজের ভয়টাকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করিবার আশায়) অত রাত্রেই ডাকাডাকি করিয়া চাকরটাকে জাগাইলাম। সে আসিয়া শপথ করিয়া বলিল যে, গেলাসে জল দিয়া একটা পিরিচ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি যখন জল খাইতে যাই, তখন সেই গেলাস পিরিচে ঢাকাই ছিল বটে। আমার ভুল হইয়াছে স্বীকার করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। বিছানায় আসিয়া শুইলাম, কিন্তু চিন্তা নূতন সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল! জল খাইল কে? আমিই ঘুমের ঘোরে জল পান করিয়াছি—এমন অসম্ভব না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব

মনে হইল না। ঘুমাইয়া পড়িবার আগে সঙ্কল্প করিলাম—কাল হইতে ঘুমাইবার আগে প্রচুর জল পান করিয়া লইব, যাহাতে মাঝ রাতে জাগিয়া উঠিয়া এরূপ অদ্ভুত সমস্যায় না পড়িতে হয়।

দিনের বেলা আর পাঁচটা চিন্তায় এসব বিষয় মনে পড়িত না। কিংবা মনে পড়িলেও হাস্যকরভাবে তুচ্ছ বোধ হইত। রাতে শুইবার আগে প্রচুর জল খাইয়া লইলাম। রাতে আর জাগিতে হইল না। ভোরবেলা চাকরে চা আনিল। আগের দিন তাড়া খাইয়াছিল—আজ ঘরে ঢুকিয়াই গেলাসটার দিকে তাকাইল, আমিও তাকাইলাম—গেলাস খালি। যে পিরিচখানা দিয়া সে জল ঢাকিত, সেখানা পাশে পড়িয়া আছে, গেলাস একখানা বই দিয়া ঢাকা। বইখানা দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিলাম—Poe-র Mystery and Imagination-এর গল্প। চমকিয়া উঠিলাম—এই বই তো নীচের লাইব্রেরী ঘরে ছিল—এখানে আনিল কে? আর গেলাসই বা খালি করিল কে? চাকরকে আর কি বলিব? নিজের চিন্তাসূত্রে কেবল নিজেই জড়িত হইতে লাগিলাম।

ক্রমে আমার প্রত্যয় জন্মিল যে, রাতের বেলায় কেহ আমার ঘরে ঢোকে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিতাম—এমন হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমি স্বহস্তে ঘরের দরজা বন্ধ করি এবং ভোরবেলা উঠিয়া স্বহস্তে বন্ধ দরজা খুলি। কিন্তু এসব বিষয় বুঝিবার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমার একটি পিস্তল ছিল, বাক্সের মধ্যে থাকিত, এতদিন পরে সেটা বাহির করিয়া বালিশের তলায় রাখিলাম।

একবার মনে হইত নির্জন বাড়ীর নিঃসঙ্গতা পরিহার করিয়া লোকজনের সঙ্গে মিশিলে হয়তো অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে অন্যত্র যাইবার শক্তি ছিল না। তা ছাড়া আমি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলাম না বলিয়া আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা স্বল্প। যে কয়েকজন আছে, সবাই কাজের লোক, কে আসিয়া সারাদিন আমার সঙ্গে গল্প করিবে? কাজেই সারাদিন একাকী থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ক্রমে অশরীরীর প্রভাব দিনের বেলাতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে হইত, পাশের ঘরে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে—কিংবা খুব মৃদু পদসঞ্চারে চলাফেরা করিতেছে। নিশ্চয় জানিতাম কেহ নাই, তবু একবার দেখিয়া আসিতাম। রেলের এঞ্জিন

বাষ্প ছাড়িলে যেমন একপ্রকার ঝঞ্ঝনা শব্দ হয়, কানের ভিতর সেইরকম শব্দ শুনিতে পাইতাম। আরও একটা ব্যাপার। মনে হইল সহসা আমার শ্রবণ শক্তি যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। স্বরগ্রামের মাঝখানের অংশটুকুই সাধারণ কর্ণ ধরিতে পারে, খুব নীচু বা খুব উঁচুর দিক শুনিতে পায় না। আমার শ্রবণশক্তির সীমানা যেন অনন্তবিস্তৃত হইয়াছে। আমি যেন কলিকাতার বাড়ীটিতে বসিয়াই পাড়ার দূরবর্তী বাড়ীগুলিতে কে কি বলিতেছে তাহারও অনেক কথা শুনিতাম। একদিন শিমুলতলার পত্র পাইলাম। তাহারা লিখিয়াছে যে, সকলে একদিন ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে। উত্তরে লিখিলাম যে, এ ঘটনা আমার অগোচর নয়। আরও লিখিলাম যে, ডাকবাংলার হাতার মধ্যে একটা গাছের উপরে ঘুঘু ডাকিতেছিল, তোমরা শুনিয়াছিলে কি? সকলে আমার উত্তরকে কবিত্ব মনে করিয়া লিখিল, ঘুঘুর ডাক যদি স্বকর্ণে শুনিতে চাও, তবে এখানে চলিয়া এসো না কেন?

ঘুঘুর ডাক শুনিবার জন্য নয়, সে তো কলিকাতায় বসিয়াই আমি শুনিতে পারি, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গিয়া পড়িলে অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, এই আশায় চাকরের উপর বাড়ী জিম্মা রাখিয়া আমি শিমুলতলায় রওনা হইয়া গেলাম। সকলে আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—এ কী, দুই মাসে যে ছয় মাসের রোগী বনিয়া গিয়াছ—ব্যাপার কি?

কেহ বলিল—শরীর অর্ধেক হইয়াছে।

কেহ বলিল—মুখ ফ্যাকাসে হইয়াছে।

কেহ বলিল—কতকাল চুল কাটো নাই।

কেহ বা বলিল—কেবল চোখ দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

সকলে সমস্বরে বলিল—এখানে কিছুদিন থাকো, সব সারিয়া যাইবে।

শিমুলতলায় একটা পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায় বসিলে মনে হয়, থিয়েটারের গ্যালারীর উচ্চতম সীটে উপবিষ্ট—সম্মুখে পাহাড় গড়াইয়া নামিয়াছে, গায়ে গায়ে ছোটবড় বাড়ী, বাগানে বাগানে শীতের মরসুমী ফুল। নিম্নে উপত্যকা, ধানের মাঠ, তখন ধানকাটা হইয়া গিয়াছে, একদিকে শীর্ণ নদী, এখানে ওখানে দেহাতি লোকের ছোট ছোট গ্রাম, উপত্যকার শেষে বন, বনের মাথার উপর দিয়া দিগন্ত

ঘেরিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়—মাথায় শাল ও বাঁশের ঘন বন। সারাদিন বারান্দায় বসিয়া থিয়েটারের দর্শকের মতো এই দৃশ্য দেখিতাম! এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মূর্তিমান চঞ্চলতার মতো রেলগাড়ী মাঝে মাঝে বেগে চলিয়া যাইত—গাছের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতাম।—এখানে আসিয়া আর একটি আবিষ্কার করিলাম। একদিন সকালে আমরা তিনজনে দূর পাল্লার ভ্রমণে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া চায়ের তৃষ্ণা পাইল। একটা থলিতে ষ্টোভ, চা, চিনি, কেটলি প্রভৃতি ছিল। কেবল দুধের অভাব। মাঠের মধ্যে দুধ পাইবার আশা নাই দেখিয়া যখন নিবৃত্ত হইতে যাইতেছি আমি বলিয়া উঠিলাম—ঐ দেখো, দূরে মাঠের মধ্যে গোটা কয়েক গরু ও রাখাল দেখা যাইতেছে—ওখানে গেলে দুধ মিলিতে পারে।

সকলে ভালো করিয়া দেখিল—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না।

আমি বলিলাম—তোমরা কেন দেখিতে পাইতেছ না? ওই তো স্পষ্ট!

তাহারা বলিল—চায়ের তৃষ্ণায় মরিতেছি. এখন ঠাট্টা ভালো লাগে না।

আর একজন বলিল—লোকে মাঠের মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা দেখে, তুমি যে 'গো-তৃষ্ণিকা' দেখিতে লাগিলে!

তৃতীয়জন বলিল—তুমি কি চোখে দূরবীণ লাগাইয়াছ নাকি।

আমি বলিলাম—অবিশ্বাসে কাজ কি? আমাদের তো যাইতেই হইবে—চলো ওই দিকেই যাই না!

সকলে নির্দিষ্ট দিকে চলিলাম—প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিবার পরে সত্যই সকলে সেই গরুর পাল দেখিতে পাইল!

আমার সঙ্গীদের একজন বলিল—কী আশ্চর্য! তুমি এক ক্রোশ দূর হইতে দেখিলে কিরূপে? তাই তোমার চোখ এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল!

আর একজন বলিল—আন্দাজে ঢিল লাগিয়াছে! মাঠে গরু চরবে এ আর বিচিত্র কি!

আর একজন বলিল—এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়!

সেই প্রথম আমি আবিষ্কার করিলাম যে, শ্রবণশক্তির মতো আমার দৃষ্টির সীমাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এখানে আসিয়া অশরীরীর প্রভাব সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলি নাই।

বলিব আর কি, বলিবার আছেই বা কি, আর বলিলেই বা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন! ভাবিতাম অশরীরী এমন করিয়া আমার কান ও চোখের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে কেন? অশরীরীর প্রভাবের সহিত যে এই শক্তিবৃদ্ধি জড়িত সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না।

এখানে কাহারও কোন কাজকর্ম ছিল না—বাড়ীর টানা বারান্দায় বসিয়া সকলে তাসপাশা খেলিত ও হল্লা করিত। আমি তাহাদের সঙ্গ এড়াইয়া পাহাড়ের উপরে একটি ছাল-ওঠা অর্জুন গাছের তলায় গিয়া বসিতাম। এখানে বসিলে দিগন্তের পাহাড়ের অর্ধচন্দ্র ও অরণ্য রেখা দেখিতে পাইতাম উপত্যকার সমস্ত দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতাম। বনের সমস্ত গাছপালাগুলা স্পষ্ট দেখিতে পাই কিনা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বনটার দিকে ভালো করিয়া তাকাইলাম। কি আশ্চর্য আমার চোখে বন আর গাছপালার ঘনীভূত সমষ্টি নয়। প্রত্যেকটি গাছ, তাহার শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লব লইয়া স্বতন্ত্রভাবে যেন দেখিতে পাইতেছি। নিজের শক্তিতে নিজেই ভীত হইলাম। যেন চোখ দুটি ও কান দুটি কোন এক জাদুকরের—আমি হতবুদ্ধি দর্শক মাত্র।

রাতের বেলার উপসর্গ আরও বিচিত্র; বুঝিলাম অশরীরী ক্রমেই আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে, অবশেষে শেষ গ্রাসে দেহটাকে হয়তো আত্মসাৎ করিয়া বায়ুরূপ বায়ুতে মিলিয়া যাইবে। রাতের বেলাতেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাসপাশা ও গানবাজনা চলিত বলিয়া স্বতন্ত্র একটি ঘরে আমার শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে ঘরে আর কেহ থাকিত না।

এই ঘরটির একটি দেয়ালে বিহারের পূর্বতন এক ইংরাজ গভর্ণরের একখানি ছবি টাঙানো ছিল। এক সময়ে শখ করিয়া টাঙানো হইয়াছিল, এখন খুলিয়া ফেলিলেও চলিত, কিন্তু নিতান্ত অবহেলাতেই খোলা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হইল, ছবিখানি খুলিয়া ফেলি, কিন্তু ততখানি উদ্যম হইল না। একবার ভাবিলাম খুলিয়া না ফেলিয়া ঘুরাইয়া দিই। গভর্ণর বিমুখ হইয়া বিরাজ করিতে থাকুক, তাহাও হইয়া উঠিল না। রাত্রে ঘুমাইলাম কোন বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভোরবেলা উঠিয়া ছবিখানার দিকে চাহিতেই দেখিলাম সেখানা ঘুরানো অবস্থায় আছে। চমকিয়া উঠিলাম, একাজ করিল কে? আমার মনের বাসনা জানিল কে? ঘরেই বা ঢুকিল কে? ঘরের

দরজা তো এখনো বন্ধ। আমিই স্বপ্নে উঠিয়া একাজ করিয়াছি? বিশ্বাস হইল না। প্রত্যয় হইল যে এ সেই অশরীরীর কাজ। ছবিখানা সোজা করিয়া দিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কাহাকেও আর বলিলাম না। বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিত না, ভাবিত আমি একপ্রকার নূতন ধাপ্পা দিতেছি। আমি সারাদিন আর সকলের হইতে দূরে সেই অর্জুন গাছটার তলায় বসিয়া কাটাইতাম। মন্দ লাগিত না—মানুষের সঙ্গ আমার বিষাক্ত লাগিত।

এই সময়ে আর একটি নূতন ভাব আমাকে পাইয়া বসিল। আমার মরিতে ইচ্ছা করিত, জীবনের আসক্তি আমাকে একেবারে ত্যাগ করিল; আমার কেবলই মনে হইত এই যে, আমার চক্ষু-কর্ণের শক্তির বৃদ্ধি, মৃত্যুর পরে মানুষ যে অসীম শক্তি পাইতে পারে, এ কেবল তাহারই পূর্বাভাস। মৃত্যুর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটার কথা মনে পড়িয়া যাইত, সেটাকে হাতছাড়া করি নাই, সঙ্গে আনিয়াছি। আরও একটা কারণে মরিতে ইচ্ছা করিত, মনে হইত একমাত্র এই উপায়েই অশরীরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, মনে হইত নিজেও অশরীরী হইয়া একবার শত্রুটার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া না লই কেন?

রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে কাহার পদশব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইত, বিদ্যুতের টর্চবাতি টিপিতাম, কেহ কোথাও নাই, হঠাৎ চোখে পড়িত দেয়ালের ছবিখানা কে যেন ঘুরাইয়া রাখিয়াছে।

এমনি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। একদিন অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে বাড়ীর সকলের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল, এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, দোষটা সম্পূর্ণই আমার। আমি সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে রনার রওনা হইলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময়ে স্পষ্ট বুঝিলাম অশরীরী আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই, সেই গাড়ীতেই সে উঠিল।

কামরাটিতে আর একজন মাত্র ছিল—একটি বার্থে তাহার শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়? স্নানের ঘরে আলো দেখিয়া বুঝিলাম, আমার সহযাত্রী সেখানে। আমি একাকী আমার বার্থে বসিয়া রহিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসাতে শুইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভাঙিল মোকামা জংসন ছাড়াইয়াছি। পাশের বেঞ্চিতে সহযাত্রীর শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়? ভাবিলাম এখনো কি স্নানের ঘরেই আছে? হওয়াই সম্ভব, আলো জ্বলিতেছে। ভাবিলাম, লোকটা

দীর্ঘকাল সেখানে কি করিতেছে? দরজায় কান পাতিয়া শুনিলাম যে, ভিতরে কে যেন গুনগুন করিয়া গান করিতেছে—আর দরজায় ঘষা কাচের উপরে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতোও দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, মানুষ ভিতরে আছে এবং সে আমার সহযাত্রী ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু লোকটা এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছে? কৌতূহল বাড়িল। দরজায় টোকা মারিলাম, ভিতরে কে—বলিয়া চীৎকার করিলাম, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করিলাম। দরজার ভিতর দিকের ছিটকিনি খট্ করিয়া খুলিয়া গেল, কিন্তু দরজা খুলিল না। মনে হইল কে যেন ভিতর হইতে প্রাণপণ বলে দরজা ঠেলিয়া আছে। দরজা খুলিয়া কোন লোককে বিব্রত করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। একবার সাড়া দিলেই আমি নিরস্ত হইতাম। কিন্তু সাড়া পাওয়াতে এবং দরজার প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমার রোখ চড়িয়া গেল—আমি দরজা ঠেলিতে লাগিলাম, অবশেষে সেই উদ্যমে কপালে ঘাম দেখা দিল।

এমন সময়ে ছোট একটা স্টেশনে গাড়ী থামিল। একজন যাত্রী উঠিল। সে আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল—কি, খুলতে পারছেন না?

এই বলিয়া সে দরজায় হাত দিতেই অনায়াসে খুলিয়া গেল। ভিতরে না আছে লোক, না আছে আলো। আমি বিদ্যুতের টর্চ লইয়া ভিতরে ঢুকিলাম, কোন লোক যে আজ সারাদিনের মধ্যে ঢুকিয়াছিল তাহার চিহ্ন অবধি নাই। তখনই মনে হইল একি সেই অশরীরীর কাণ্ড? ওই শয্যার মালিক কি সেই অশরীরী? আমি ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে গল্প করিয়া রাত কাটাইয়া দিতাম, কিন্তু বুকের ভিতরের কাঁপুনি কিছুতেই থামিল না! চুনারে নামিবার সময় অবধি বিছানার মালিকের দেখা পাইলাম না।

চুনার পৌছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। স্টেশনে নামিয়া একজন ওই দেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিয়া লইলাম, তাহার কাছে সন্ধান লইয়া একখানা এক্কা গাড়ীতে চড়িয়া গঙ্গার ধারে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একজন কেয়ারটেকার দারোয়ান ছিল তাহাকে শুধাইলাম, এ বাড়ীতে থাকিতে পারা যাইবে কিনা এবং কিরূপ ভাড়া লাগিবে?

দারোয়ানজী বলিল—আপনার যতদিন খুশি থাকুন, খুশী হইয়া যাহা দিবেন তাহাই যথেষ্ট।

আহারের ব্যবস্থার কি করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'বর্তন উর্তন' তাহার কাছেই পাওয়া যাইবে আর 'রসুই' করিবার জন্য একটা লোকও সে ঠিক করিয়া দিতে পারে। 'লেকিন মছলি-উছলি' চলিবে না। আমি ধন্যবাদ দিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম এবং জানাইয়া দিলাম যে মছলি খাইবার ইচ্ছা আমার নাই। তখন দারোয়ানজী সোৎসাহে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে লাগিয়া গেল।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড ও পুরাতন, আগেই বলিয়াছি। আধুনিক কৃপণ কল্পনার যুগে এত বড় অনাবশ্যকের আকাশ-ভরা বাড়ী কেহ তৈয়ারী করে না। বাড়ীর ঠিক সমুখেই গঙ্গা—এখন বসন্তকালে বাড়ীর কাছে অনেকটা চর পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া নদীর বিস্তৃতি অল্প নয়। গঙ্গার উপরেই প্রশস্ত টানা বারান্দা। আমার ব্যবহারের জন্য দুটি ঘর পাইলাম, একটি বসিবার, অপরটি শুইবার। বসিবার ঘরে পুরু গদিওয়ালা খানকতক চেয়ার ও টেবিল। আর শয়নঘরে একখানা মস্ত পালঙ্ক, পাশে একটা চেয়ার, টেবিল, আলনা। আর আছে ঘরের দেয়ালে মানুষপ্রমাণ পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা আয়না।

আহার শেষ করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়া কাটাইয়া দিলাম। রাত্রে অল্প কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেকদিন পরে এই আমার বিঘ্নহীন সুনিদ্রা হইল। ভোরবেলা উঠিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিলাম, ভাবিলাম তবে বোধ হয় অশরীরীর হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম। আজ তিন চার মাসের মধ্যে নির্বিঘ্ন নিদ্রার আরাম আমি পাই নাই, শরীর ভাঙিয়া পড়িবার মতো, মৃত্যু-ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ। যেটুকু ঘুম আমার হইত, তাহা যেন ওই অশরীরীর নেপথ্যবিধানের জন্যই হইত। নিদ্রার অবসরে হয় গেলাসের জল ফুরাইত, নয় ছবিখানি ঘুরিয়া যাইত। ঘুম এবং ঘুম না হওয়া দুই-ই আমার পক্ষে সমান আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গত রাত্রের নিশ্চিন্ত ঘুমে তাই প্রফুল্ল বোধ করিলাম।

ভিখু নামে এক ছোকরা ভৃত্যকে দারোয়ানজী ঠিক করিয়া দিয়াছিল। সে কাজকর্ম সব জানে। চা, জলখাবার, ডালভাত, তরকারি, রুটি পুরি যাহা প্রয়োজন সমস্ত সময় মতো করিয়া আনিত। ঘর ঝাড়ু দিত, বিছানা

পাতিয়া দিত। কোন বিষয়ে আমার ভাবিবার আবশ্যক ছিল না। আমি সারাদিন বসিয়া, গড়াইয়া, বেড়াইয়া কাটাইয়া দিতাম।

চুনার প্রবাসের দ্বিতীয় দিন বিকালে আমি গঙ্গার তীর বরাবর বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া প্রাচীন বয়সের ঝাউগাছে ঘেরা একটি সমাধিস্থান দেখিতে পাইলাম। অনেকগুলি মুসলমানের কবর। কবরগুলি এখনো সুরক্ষিত। পাশেই ছোট একখানা খাপরার ঘরে একজন বৃদ্ধ মুসলমান বাস করে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে, এই কবরগুলি রক্ষা ও মেরামত করিবার জন্য ছোট একটি জায়গীর আছে—সে তার মালিক বা জিম্মাদার। তাহার মুখেই শুনিলাম যে, বহুকাল আগে এখানে হুমায়ুন বাদশার সঙ্গে শেরশাহের জবর লড়াই হইয়াছিল। অনেক মোগল পাঠান মরিয়াছিল। হুমায়ুন বাদশাহি লাভ করিবার পরে এখানকার কবরগুলির খবরদারির জন্য জায়গীর দান করেন। সেই জায়গীরের ধারা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

ইতিহাসে শেরশাহ ও হুমায়ুনের লড়াইয়ের কথা পড়িয়াছি বটে। আর ওই যে অদূরে গিরিচূড়ায় চুনার গড় তাহাও সুবিদিত। গিরিচূড়াবলম্বী সেই গড়ের ছায়াতে চিরনিদ্রিত এই কবরগুলির উপরে প্রাচীনকাল যেন সযত্নে অঞ্চল বিছাইয়া দিয়াছে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। সম্মুখে গঙ্গা, পিছনে স্তম্ভিত চুনার গড়—আর চারিদিকে শ্মশানের ধূমের মতো ধূসর ঝাউ গাছ, ইতিহাসের দীর্ঘনিশ্বাস যেন তাহাদের শাখায় শাখায় নিরন্তর শ্বসিত হইতেছে। স্থানটি আমার মনকে বড়ই টানিল, আমি সেখানে বসিলাম। কতক্ষণ এরকম বসিয়াছিলাম জানি না—যখন হুঁশ হইল, দেখিলাম গঙ্গার ওপারে তৃতীয়ার অস্তমান চন্দ্রকলা গাছের আড়াল দিয়া হুমায়ুনের গুপ্তচরের মতো এ পারের পরিপ্রেক্ষিতকে লক্ষ্য করিতেছে। আমি উঠিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। সমুদ্রের জোয়ারের গর্জনের মতো ঐ ঝাউয়ের একটানা হু হু শব্দ কান ভরিয়া লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময়ে আমার নূতন জুতা-জোড়া পাইলাম না, সন্দেহ হইল এ ভিখুর কাজ। তাহাকে ডাকিলাম, শুনিলাম সে বাজারে গিয়াছে। অগত্যা আর এক জোড়া জুতা পরিয়া বাহির হইলাম। সেই ঝাউ-ঘেরা গোরস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া এক জায়গায় বসিলাম। এমন সময়ে গোরস্থানের রক্ষক

সেই বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। শুধাইলাম, খবর কি? সে বলিল—বাবুজি, কাল অনেক রাত্রে দুই বাবু এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ বোধ হয় এক জোড়া জুতা ফেলিয়া গিয়াছেন।

তারপরে নিবেদন করিল আমি যেন খোঁজ করিয়া জুতা-জোড়া মালিককে দিই। আমি তাহাকে জুতা আনিতে বলিলাম। লোকটা জুতা আনিলে আমি চমকিয়া উঠিলাম—একি! এযে আমার জুতা!

আমার বিস্ময় তাহার কাছে প্রকাশ না করিয়া বলিলাম—কি রকম লোক, আর একবার বলো তো।

সে বলিল—বাবুজি, আমি অন্ধকার রাত্রে দূর হইতে দেখিয়াছি—কি রকম লোক কেমন করিয়া বলিব? তবে দুইজন লোক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাহার কথায় আমার বিস্ময় বাড়িয়া ত্রাসে পরিণত হইল। আমি খোঁজ করিয়া মালিককে দিব জানাইয়া জুতা জোড়া একটা কাগজে মুড়িয়া লইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া ভাবিলাম এ কেমন হইল? আমিই কি রাত্রে সেখানে গিয়াছিলাম? স্বপ্নে বা নিশিতে পাইলে লোকে এমন বেড়াইয়া থাকে শুনিয়াছি—তবে কি আমারও সেই রোগ হইল! কিন্তু সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? সেই অশরীরী নয় তো? তবে কি সেই অজ্ঞেয় সত্তা অশরীরী নয়? নতুবা কবররক্ষক তাহাকে দেখিল কিভাবে? অজ্ঞাতসারে ঘুমের ঘোরে আমি কি তাহার ভ্রমণসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছি নাকি? এই কথা মনে হইবামাত্র সেই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে গা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—দেহের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হইয়া উঠিল। সঙ্কল্প হইল আজ হইতে রাত্রে আর ঘুমাইলে চলিবে না। স্থির করিলাম দিনের বেলা ঘুমাইয়া লইয়া রাতটা জাগিয়া কাটাইব।

রাত্রিটা জাগিবার সঙ্কল্প করিলাম। হঠাৎ বোধ হয় একবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—দরজায় করাঘাতে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে—বলিয়া চীৎকার করিলাম—আর কোন সাড়া নাই। আবার জাগিবার চেষ্টা চলিল—বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—আবার দরজা নাড়ার শব্দ।

বুঝিলাম এ সেই অশরীরী ক্রিয়া। বুঝিলাম অশরীরী আজও তাহার ভ্রমণসঙ্গীর সন্ধানে আসিয়াছে, কাজেই এবারে আর সাড়া দিলাম না। চুপ

করিয়া বসিয়া রহিলাম। এমনিভাবে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাতটা কাটিয়া গেল।

তারপরে প্রতি রাত্রে এমনিধারা চলিতে লাগিল। জাগরণে ও তন্দ্রায় আমার চোখে মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে—যেমনি একটু তন্দ্রা আসে, অমনি দরজা নাড়ার শব্দ, নতুবা বাহিরে পদধ্বনি শুনিতে পাই। একদিন হঠাৎ পিঠের উপরে কাহার তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ঘর নির্জন, কেহ কোথাও নাই।

কয়েকদিন এমনি চলিলে আমার শরীর আরও ভাঙিয়া পড়িল! ভাবিলাম এরকম চলিতে থাকিলে এই বিদেশেই মরিতে হইবে। আমার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল এ যাত্রা আমাকে মরিতেই হইবে—ভাবিলাম মরিতেই হয় তো কলিকাতা ফিরিয়া মরিব—বিদেশে বিভুঁয়ে মরিব কেন? এতক্ষণ বারান্দায় বসিয়াছিলাম, এবারে কি একটা কাজে ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল আয়নার মধ্যে যেন কাহার ছায়া? আবার তাকাইলাম, শূন্য আয়না ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই।

একবার মনে হইল আমার ছায়া—পরক্ষণেই বুঝিলাম আমার ছায়া হইতেই পারে না, কারণ আমি যেখানে দাঁড়াইয়া সেখানকার ছায়া আয়নায় পৌছায় না। তবে এ কী দেখিলাম! বিশ্বাস জন্মিল যে, আমি কোন দুর্জ্ঞেয় সত্তার ষড়যন্ত্রের শিকার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া সবে ঘরে ঢুকিয়াছি, দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম, মনে হওয়া বা অনুমান করা নয় যে, আয়নার উপরে ছায়া। শুধু এক বিদ্যুৎ ঝলকের জন্য, শুধু জলে দাগ কাটার মতো, কিন্তু সত্যই যে দেখিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনি মনে পড়িল—ঘর তো অন্ধকার, এখনো আলো জ্বালানো হয় নাই, তবে ছায়া পড়িবে কি উপায়ে? বিদ্যুতের টর্চ টিপিলাম। শূন্য ঘর। ঘরের সেই সুবৃহৎ শূন্যতাকে একটা বিরাট হাঁ-র মতো মনে হইল।

অবশেষে কিভাবে আমার ত্রাস যে রোখে পরিণত হইল সে প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই, তবে আমার ধারণা এই যে, কোন একটা মনোভাব চরমে পৌছিলে তাহা অপর একটা মনোভাবে পরিণত হয়, মানুষের মনের সব ভাবগুলার মধ্যে গোপন চলাচলের একটা পথ আছে বলিয়াই এমন বোধ করি সম্ভব হয়।

আমার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল যে, মরিতেই যখন হইবে, মরিতেই যখন বসিয়াছি—অশরীরীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া মরিব, আর কিছু না পারি তাহাকে শিকারের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া মরিব। মৃত্যু যখন আমার আসন্ন, মনে হইল—এইভাবে মরিলেই আমার মরা সার্থক হইবে। আমি স্থির করিলাম যে, আর দুই এক রাত্রি অশরীরীর রহস্যোদ্ঘাটনের শেষ চেষ্টা করিব। পারি তো উত্তম, না পারি তো নিজের প্রাণ নিজের হাতে লইব, অশরীরীর শিকারে পরিণত হইব না। এখন হইতে গুলিভরা পিস্তলটা সর্বদা পকেটে রাখিতে লাগিলাম।

সেদিন রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি হইবে যখন ভাবিয়াছিলাম তখন কে জানিত যে, সেই রাত্রিই আমার মোহমুক্তির রাত্রি হইবে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়াছিলাম—বলা বাহুল্য—একাকী। রাত্রি ঘন অন্ধকার—দূরাগত ঝাউগাছের হু হু শব্দ পরলোকের তীরভূমি হইতে বাহিত দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শ্রুত হইতেছিল; সমুখে গঙ্গা—সেখানে অন্ধকার কিছু ফিকা, নতুবা বুঝিবার আর কোন উপায় নাই। বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় মনে হইল, ঘরের মধ্যে কে যেন শিস্ দিতেছে। দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম—আজ আমার মনে আর ভয় ছিল না। অশরীরীকে গুলি বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা সম্ভব হইলে অবশ্যই করিতাম, কিন্তু মনের ওই অবস্থাতেও বুঝিয়াছিলাম যে, তাহা সম্ভব নয়, তাই নিজেই মরিব। অশরীরীর উপস্থিতিতে নিজের হাতেই মরিব, তাহার শিকার ফস্‌কাইয়া যাইবে, সে হতাশ হইবে। সে কি আনন্দ! ঐ এক আনন্দই তখন জীবনে অবশিষ্ট ছিল। উৎকট উল্লাসে হাসিয়া উঠিলাম। অনেক দিন হাসি নাই; এত উচ্চস্বরে কখনো হাসি নাই, নিজের হাসিতে নিজে চমকিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সেই ছায়া ঈষদালোকিত কক্ষের আয়নার উপরে সেই ছায়া—শুধু এক পলকের জন্য। পিস্তল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দরজাটা খোলা ছিল, বন্ধ করিয়া আসিলাম। তখন আমার মুখ দরজার দিকে। আমার ঠিক পিছনে দেয়ালের গায়ে আয়না। পিছনে সেই শিস্ দিবার শব্দ। পিছন ফিরিবামাত্র ছায়াশরীরী অশরীরী। মনে হইল সে যেন আর আয়নার উপরে নাই। আমার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিবার আগেই পিস্তল তুলিয়া নিজের মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম, কেবল তড়িদ্‌বেগে

মনে হইল, আমার ঠিক পিছনে সে যখন রহিয়াছে, সেও মরিবে। এক গুলিতে শিকার ও শিকারীর দুইজনেরই জীবনাবসান।

বোধ হয় হাত একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল। শূন্য ঘরে পিস্তলের শব্দ মাথা কুটিতে লাগিল। পিছন হইতে একটা নিদারুণ নিষ্ঠুর হাসির খন্‌খন্ শুষ্ক আওয়াজ কানে আসিল, মনে হইল অশরীরী আমার ব্যর্থ চেষ্টাকে ধিক্‌কার করিয়া হাসিতেছে। চারিদিকে বারুদের গন্ধ। ঘরের মেঝে কাঁপিতেছে, ছাদ ঘুরিতেছে, সমস্ত অন্ধকার।

পরদিন যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমি শয্যার উপরে শায়িত, ভিখু মাথায় বাতাস করিতেছে। পায়ের কাছে দারোয়ানজী গম্ভীর মুখে দণ্ডায়মান। শিমুলতলার ঠিকানায় একটা তার করিতে বলিয়া আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল দেখিলাম যে, আমার পরিবারের জন তিনেক কাছে বসিয়া আছে। তাহাদের বলিলাম—আজই আমাকে এখান হইতে লইয়া চলো।

পরদিন প্রাতে শিমুলতলায় আসিয়া পৌছিলাম।

এই ঘটনার পরে পাঁচ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে, এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। অশরীরীর স্মৃতি আমার মনে ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সত্য করিয়া বলি এই রহস্যের উত্তর আজও পাই নাই। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিয়া সেই পুরাতন উত্তর পাইয়াছি। 'নার্ভাস শক।' মনস্তাত্ত্বিক-দের জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা 'সাব্‌জেকটিভ রিঅ্যাকশন। বন্ধুরা বলে আমি ধাপ্পা দিতেছি কিন্তু আমি জানি, মর্মান্তিক-ভাবে জানি সমস্তই নিদারুণ সত্য। কেমন করিয়া না জানি অশরীরীর মোহময় খোলসের মধ্যে আমি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম—সেই রাত্রের পিস্তলের গুলি সেই মোহভেদ করিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। অশরীরীর নিজের ব্যর্থতায় আত্মধিক্‌কারের অট্টহাস্য করিয়া আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বন্ধুরা বলে ওসব তোমার কবিত্ব। যাহাকে ধিক্‌কারের অট্টহাস্য বলিতেছ বস্তুত তাহা পিস্তলের গুলি লাগিয়া সেই বৃহৎ আয়নাখানা ভাঙিবার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বুঝাইতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি।

বিনা টিকিটের যাত্রী

ঠিক স্টেশনে ঢুকিবার মুখেই গাড়ীখানা ছাড়িয়া গেল। এতক্ষণ ছুটিতেছিলাম এবার থামিলাম। চাকরের মাথায় বিছানা, সে তখনো ছুটিতেছে, বলিলাম, ওরে এবার থাম, আর ছুটে কি লাভ? এমন অদ্ভুত আদেশ সে শোনে নাই, সর্বদাই শুনিতেছে, 'ওরে আর একটু তাড়াতাড়ি', 'কেবলি ব'সে থাকে' ইত্যাদি। তার অভ্যাস অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে, সে থামিল না, ছুটিতেই লাগিল। ভাবিলাম, ছুটুক, অভ্যাস খারাপ করিয়া কাজ নেই।

মফঃস্বলের ছোট স্টেশনে রাত্রিবেলা গাড়ী ফেল করিলে কি দুর্দশা হয় অভিজ্ঞতা ছাড়া বোঝা যাইবে না। তাহাতে আবার শীতের রাত্রি গ্রীষ্মকাল হইলেও বা বাহিরে পায়চারি করিয়া কতকটা সময় কাটাইতে পারিতাম। চাকরটা একান্তে বিছানা রাখিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, গাড়ী ফেল হয়েছে, আমাকে আজ রাত্রে স্টেশনে থাকতে হবে।

সে অবাক্ হইল। তাহার সর্বশক্তিমান মনিবের জন্য গাড়ী একটু অপেক্ষা করিল না—এ কেমন কথা।

তাহাকে বলিলাম—তুই কি এই রাত্রেই বাড়ী ফিরে যাবি?

সে বলিল—আপনিও চলুন।

সর্বনাশ! অন্ধকারে আবার পাঁচ-ছয় মাইল পথ হাঁটিতে পারিব না, তার উপরে কাল ভোরের গাড়ী যে পুনরায় ফেল করিব না তাহার নিশ্চয়তা কি?

তাহাকে কিছু পয়সা দিলাম। বুঝিলাম, পয়সা ও সে একসঙ্গে বাড়ী পৌঁছিবে না; মাঝ পথে এক জায়গায় চোরাই মদের ভাঁটি আছে—একটা সেখানে থাকিয়া যাইবে, দুইটাও থাকিয়া যাইতে পারে। চাকরটা বাড়ীর উদ্দেশে অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

এবারে রাত্রি যাপনের উপায় আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইলাম। এর মধ্যে আবার উপায়? স্টেশন বলিতে একখানা টিনের ঘর, তাহারই একটা

দিক ঘিরিয়া লইয়া স্টেশনের কামরা। বাকি অংশটা সম্পূর্ণ খোলা, দেয়াল বলিতে কিছু নাই, অবশ্য কয়েকটা লোহার খুঁটি আছে, বেশ হাওয়া বাতাস খেলে। অন্ধকারের মধ্যে উত্তরের দিক হইতে স্বাস্থ্যকর হাওয়া আসিতেছিল—কিন্তু উপভোগ করিবার লোকের অভাব। স্টেশন ঘরে অবশ্য বাবুরা আছেন, কিন্তু তাঁহারা উত্তরের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, বুঝিলাম শীতের হাওয়ার তাঁহারা ভক্ত নহেন। আমারও প্রায় সেইরূপ মনোভাব—কিন্তু আজ নিরুপায়।

ডান দিকের কোণে ছোট একটি ঘর আছে বটে, সেখানে দরজার উপরে এক টুকরা কালো কাঠ আঁটাও রহিয়াছে, খুব সম্ভব তাহার গায়ে "Waiting Room" কথাটিও লিখিত আছে। কিন্তু হইলে কি হয়—আজ ওখানে কয়েকমাস যাবৎ মালবাবু সপরিবারে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার সরকারী টিনের ঘর ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। কাজেই ওদিকটায় ঘেঁষিয়া লাভ নাই। অগত্যা বামদিকেই অর্থাৎ স্টেশনের কামরার মধ্যে ঢুকিলাম। স্টেশনের ঘড়িটার কাঁটা কুড়িটার কাছে। মাঝখানে একখানা বড় টেবিল, বেশ প্রশস্ত, তার উপরে একরাশ খাতাপত্তর, দোয়াত কলম, টেলিফোনের ষ্ট্যাণ্ড, গোটা দুই চায়ের পেয়ালা—খুব সম্ভব শেষোক্ত জিনিসগুলি সরকারী সম্পত্তি নয়। টেবিলের উপর একজন বাবু (গায়ে সরকারী কোর্তা দেখিয়া বুঝিলাম স্টেশনের কর্মচারী) জড়সড় হইয়া শায়িত। এতক্ষণে বোঝা গেল, প্রশস্ত টেবিলের উপকারিতা কোথায়। আর একজন বাবু সরকারী কোর্তা গায়ে দিয়া হাত-লণ্ঠনের আলোতে কতকগুলি টিকিট মিলাইয়া লইতেছেন, যে-ট্রেনখানা আর একটু আগে আসিলেই পাইতাম, লুচির সঙ্গে আলুর দম খাইতে গিয়াই এই বিপদ, তাহারই যাত্রীদের টিকিট।

বাবুটির মনোযোগ আকর্ষণের আশায় কাশিলাম, মেজেতে জুতার শব্দ করিলাম, কয়টা বাজিয়াছে স্পষ্ট দেখিয়াও ক'টা বাজে জিজ্ঞাসা করিলাম—কিন্তু স্টেশনের বাবুদের অসীম মুমুক্ষা, তাঁহারা জানেন সকলের সব কথার উত্তর দিতে গেলে সংসার চলে না। এবারে দু'টি বিড়ি বাহির করিয়া একটি তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলাম। তাঁহার সাধনায় ফাঁক ছিল। টুক করিয়া বিড়িটা লইয়া যেমন কাজ করিতেছিলেন, তেমনি করিয়া চলিলেন; না, মাঝখানে একবার পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া বিড়ি ধরাইয়াছিলেন। দেশলাই আমার পকেটেও ছিল, কিন্তু, আমার যে

তাঁহার দেশলাই উপলক্ষে তাঁহার মনোযোগটি চাই, বলিলাম, দেশলাইটা—এসব বাক্য শেষ করিবার প্রয়োজন হয় না; এক্ষেত্রে তিনি শেষ করিবার সুযোগও দিলেন না, ইঙ্গিতে লণ্ঠনটা দেখাইয়া দিলেন। সরকারী লণ্ঠনটা খুলিবার কৌশল না জানায় নিজের দেশলাই দিয়াই বিড়ি ধরাইলাম।

ঠনক, ঠনক!

আপ, ডাউন দুটা কালো বাক্স স্টেশনে থাকে, কি নাম জানি না! একটা ঠনক ঠনক করিয়া বাজিয়া উঠিল।

এবারে বাবু মুখ তুলিয়া কালো বাক্সটার নিকটে গিয়া টেলিফোন কানে তুলিলেন।

—কে, সুরেন নাকি?…হাঁ, আমি প্রবোধ! বেশ! বেশ! কাল দুপুর নাগাদ যাবো! আরে বল কি? তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন—আর যাবো না! নিশ্চয় যাবো, দুপুরের একটা মালগাড়ীতে যাবো! না, না, চিন্তা ক'রো না।

এগুলো বোধ করি সরকারী সংবাদ নয়। নাই হোক, সরকারী কলে বে-সরকারী কথা বলিতে বাধা নাই।

বুঝিতে পারিলাম, আপ ডাউন কোন দিকের স্টেশনে এক বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন! আনন্দের সংবাদ!

বাবুকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, উনি বুঝি আপনার আত্মীয়?

বাবুর ঠোঁট দু'টি একটু নড়িল, বুঝিলাম কিছু বলিলেন। শুনিতে পাই আর না পাই তাতে কি? আমার উদ্দেশ্যে কথিত তো! একি আমার কম আনন্দ!

—আর একটা বিড়ি ইচ্ছা করুন।

—দিন।

এবারে স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি।

—বসুন না!

আহা, এতক্ষণে একটা গতি হইল। স্টেশনের মানুষ হইলেও অমানুষ নন, আমিই এতক্ষণ ভুল বুঝিতেছিলাম।

একখানা চেয়ারের ওপর একগাদা খাতা ছিল, নামাইবার উদ্যম করিতেই বলিলেন, নামাবেন না, ছারপোকা আছে।

—কিন্তু খাতাগুলো কি নষ্ট হবে না?

—নষ্ট হবে কেন? ওগুলো তো এজন্যেই আছে।

তা বটে, আমরা বাহিরের লোকে কেমন করিয়া জানিব কার কি প্রকৃত ব্যবহার!

বাবুটি বলিলেন—কোথায় যাবেন?

—আজ্ঞে, কলকাতা।

—এত আগে কেন? কাল সেই ভোরে গাড়ী?

বলিতে পারিতাম যে, এত পরে কেন? কিন্তু কিছু না বলিয়া বোকা সাজিয়া রহিলাম, হয়তো তাহাতেই দয়ার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা!

—রাতে থাকবেন কোথায়?

—এখানেই কোথাও।

—আর কোথায়! ওখানেই আজ আপনাকে রাত কাটাতে হবে। ভালো ক'রে বসুন।

বিড়ির অসীম শক্তি। নামটাও মোহিনী বিড়ি কিনা!

কিছু কথা বলা দরকার, চুপ করিয়া থাকা চলে না, নতুবা চেয়ারে বসিবার অধিকার হারাইতে কতক্ষণ!

—এগুলো টিকিট বুঝি? লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, তবু দেখি ঐ প্রশ্নের সূত্রে যদি কথার সূত্রপাত হয়!

—আর বলেন কেন?

টিকিটগুলা সুতা দিয়া জড়াইতে আরম্ভ করিলেন—আজ এক বেটা ট্রেন থেকে নেমে টিকিট না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিচ্ছিল।

গা ঢাকা দিবার উদ্দেশ্য থাকিলে অন্ধকারই প্রশস্ত, এতে বিস্মিত হইলে চলিবে কেন?

—তার পরে?

—আমার কাছে চালাকি নয়। দেখি যে লোকটা প্লাটফর্ম পেরিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, অমনি দৌড়লাম, লোকটাও দৌড়ল—(আশ্চর্য)!—গিয়ে ধরলাম—ঐ বাদামতলায়, সেখানে যেমন অন্ধকার, তেমনি জঙ্গল!…হাঁ, আদায় করে নিলাম!

ঐ আদায়টুকু সরকারী তহবিলে গেল না বে-সরকারী পকেটে ঢুকিল এসব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইলেও তুলিতে নাই। বলিলাম, আপনার কাছে পারবে কেন, আপনি যে রকম স্মার্ট!

—আপনি বুঝছেন দেখছি ! আর বুঝবেন নাই বা কেন, হাজার হোক—

হাজার হোক কি তা আমিই জানি না, উনিই বা জানিবেন কিরূপে ?

—আর-একটা বিড়ি আছে নাকি ?

বিড়ি হস্তান্তরিত হইল।

—নিন, আরাম ক'রে টানুন। সারাটা রাত কাটাতে হবে।

—বেশ বিড়ি !

মোহিনী বিড়ি। 'কি মোহিনী জানো বন্ধু কি মোহিনী জানো।'

—ঠনক, ঠনক !

—নাঃ, বিরক্ত ক'রে মারলে !

বাবুটি উঠিলেন। এবারে আর সামাজিক নিমন্ত্রণ নয়, মালগাড়ীর আগমন সংবাদ !

—রামশরণ ! এই রামশরণ !

টেবিলের তলের একটা পুঁটুলি নড়িয়া উঠিল।

বাবু পা দিয়া ঠেলা দিলেন। সর্বাঙ্গে কম্বল জড়াইয়া যে লোকটা টেবিলের তলা হইতে বাহির হইল—তাহারই নাম তবে রামশরণ।

বাবুটি রাষ্ট্রভাষায় যাহা বলিলেন তাহার মর্ম—মালগাড়ী আসছে, ডাউন দে গিয়ে।

নিদ্রাজড়িত চোখে রামশরণ বাহির হইয়া গেল। আজ মালগাড়ীর একটা ফাঁড়া আছে বুঝিতে পারিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারকে মথিত করিয়া একটা শব্দের ঝড় বহিয়া গেল।

উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইলাম, বাহিরে অন্ধকার, নিরেট ঘন কালো, আকাশের তারাটিও দৃশ্যমান নয়, যেন সুগভীর কয়লা খাদের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছি। জানালার কাচ ভেদ করিয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা, আকাশের তলে না জানি আরও কত ! আজ খোলা চালার মধ্যে থাকিলে শিক্ষাই হইত বটে ! পাছে চেয়ারখানা হারাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চাপিয়া বসিলাম।

—এই ওঠ্ ওঠ্, মাষ্টারবাবু আসছেন।

—ঘুমোতে দিল না দেখছি, বলিয়া গভীর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, টেবিলে শায়িত লোকটি উঠিয়া বসিলেন।

—কি হয়েছে ?

—মাষ্টারবাবু আসছেন।

এমন সময়ে পায়ে ভারী জুতার শব্দ তুলিয়া, হাতে একটা লণ্ঠন দোলাইতে দোলাইতে, মাথায় মুখে আগাগোড়া আলোয়ান জড়াইয়া মাষ্টারবাবু ঢুকিলেন। মাষ্টারবাবুর প্রকাশ্য অংশ নাকের দুটি ফুটো এবং চোখের দুটি ফুটো।

—আঃ, কি শীত পড়েছে, তবু তো সবে কার্তিক মাস!

হাতের লণ্ঠন মেজেতে রাখিয়া মুখের আলোয়ান সরাইলেন, একজোড়া কাঁচা পাকা মলোটভি গোঁফ বাহির হইয়া পড়িল।

এবার বুঝি আমাকে চেয়ারখানি ছাড়িতে হয়। না, তিনি অন্য একখানি চেয়ারে বসিলেন। একটা মোহিনী বিড়ি দেব নাকি? তাঁহার মর্জির ব্যতিক্রম হইলে শীতের রাত্রি বাহিরে কাটাইবার আশঙ্কা।

প্রবোধবাবু, সেই যিনি মোহিনী বিড়ির গুণে মুগ্ধ, আমার কাছে একটি বিড়ি চাহিয়া লইয়া মাষ্টারবাবুর দিকে আগাইয়া দিলেন, বলিলেন, স্যার আজ একটা প্যাসেঞ্জার ভারি মুশকিলে ফেলেছিল!

—শুনেছি, শুনেছি, ওহে ছোকরা কাজটা ভালো করনি।

মাষ্টারবাবু বিড়িটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রবোধ অবাক, ভাবিয়াছিল কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য প্রশংসা পাইবে।

—আজকাল W.T. ধরবার জন্য প্রেশার দিচ্ছে।

—কিন্তু ঐ করতে গিয়ে বিপদে পড়লে কে ঠেকাবে শুনি?

সদ্য নিদ্রোত্থিত বলিলেন—হ্যাঁ, যাত্রীরা অনেক সময়ে মারপিট করে।

—তবেই বুঝেছ!

—আর কি বিপদ হ'তে পারে?

—ঐ জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল তো?

—সাপখোপ হবে।

—শীতকালে সাপখোপ কোথায়?

—তোমরা কেবল সাপ আর উপরি-অলা দেখ্ছ। কিন্তু মনে রেখো যে উপরি-অলারও বাবা আছে! যেটুকু রয়সয় ক'রো, রাত-বিরেতে প্যাসেঞ্জারের পিছনে পিছনে তোমার অন্ধকারে যাবার দরকার কি শুনি? প্রোমোশন হবে? প্রাণটা গেলে প্রোমোশন পাবে কে ভেবে দেখেছ?

একটু থামিয়া বলিলেন—আরে বাপু প্লাটফর্ম অবধি তোমার জুরিসডিক্‌শন। তার মধ্যে ধরতে পারলে ভালো—আবার বাইরে যাওয়া কেন? বয়স অল্প কিনা! তায় আবার নূতন চাকরি, উৎসাহ বেশী। দাও—

বিড়ি নাই দেশলা ?

দেশলাইটাই বটে! বিড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। মাষ্টারবাবুর বাঁ গালে মস্ত একটা আঁচিল—এতক্ষণ অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই, দেশলাই কাঠির আলোতে চোখে পড়িল।

নাঃ, মোহিনী বিড়ির গুণ আছে! মাষ্টারবাবুর মুখে এতক্ষণ পরে কতকটা মানবিক ভাব দেখা দিয়াছে।

—আপনি বুঝি ট্রেন ফেল করেছেন ?

কৃতার্থ হইয়া বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

—আজ তবে ওখানে ব'সেই রাত কাটাতে হবে দেখছি।

যদি না বাহির করিয়া দেন।

—শুনুন মশাই, শুনুন। আপনার বয়স হয়েছে বুঝ্‌তে পারবেন—এরা সব ছেলে-ছোকরা, আমাদের মতো বুড়োর কথা বিশ্বাস করে না।

ভাবিলাম, আমাদের বলিতে আমিও নাকি? বুঝিলাম রাত্রি জাগরণের আশঙ্কায় নিশ্চয় মুখটা অনেকখানি শুকাইয়া গিয়াছে, নতুবা বুড়োর দলে পড়িবার গৌরব এখনও অর্জন করিতে পারি নাই।

—তখন কেবল সার্ভিসে ঢুকেছি 'রিলিভিং হ্যাণ্ড,' আজ এ স্টেশনে, কাল ও স্টেশনে এমনি ছুটে বেড়াতে হয়। সেদিন গিয়েছি, না, স্টেশনের নামটা নাই বললাম, কে আবার কি ভাববে? এমনি শীতকাল, না শীত আরও একটু বেশি হবে, তারিখটা কিনা ছিল পয়লা ডিসেম্বর—

মাষ্টারবাবু শুনিতে পান এমন অস্ফুট স্বরে প্রবোধ অপরজনের উদ্দেশ্যে বলিল—কি মেমরি !

মাষ্টারবাবু প্রশংসাটুকু গ্রহণ করিলেন কিন্তু মূল্য দিলেন না, শুনিতে পান নাই এমনভাবে আমার উদ্দেশ্যে বলিলেন, নিন ভালো ক'রে বসুন, আপনার তো তাড়া নেই গল্পটাও ছোট নয়।

আমি আলোয়ানখানা ভালো করিয়া জড়াইয়া লইয়া বসিলাম, মাষ্টারবাবু আরম্ভ করিলেন—

সেদিন সকালেই পৌঁছেছি সেই নূতন স্টেশনে, পৌঁছেই বর্ধমান লোকালের দুই W.T.-কে ধরে' ফেলেছি, পিছন দিক দিয়ে গুড় গুড় ক'রে পালাবার চেষ্টায় ছিল। আমি গিয়ে খপ ক'রে দু'জনের হাত ধরে' ফেলেছি, তারা পালাবার জন্য টানাটানি শুরু করলো! তারা দু'জন আমি একা!

কিন্তু পারবে কেন ? তখন আমি ইয়ংম্যান, যেমনি স্মার্ট তেমনি গায়ে শক্তি রাখি। একা তাদের টেনে নিয়ে স্টেশন ঘরে এলাম। মাষ্টারবাবু বললেন—হাঁ, বাহাদুর ছোকরা বটে ! W.T.-র আমি ছিলাম যম ! ওর আগে ছিলাম রিষড়েয়—ছ' মাসে প্রায় আড়াই শ W.T. ধরেছিলাম। মাষ্টারবাবু প্রোমোশনের জন্য আমাকে Recommend করেছিলেন। তিনি বলতেন, নাঃ, এ ছেলেকে কেউ আটকাতে পারবে না, D.T.S. হ'য়ে তবে ছাড়বে।

এবারে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, বলিলেন, ভাবছেন তবে আজ আমার এ দশা কেন ? সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি।

এই বলিয়া নিভন্ত বিড়িটায় কষিয়া কয়েক টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন। ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখি দুটা কাঁটা চব্বিশটার কাছে গিয়া মিলিয়াছে। বাহিরে অন্ধকারে শীতের মধ্যে ঝিঁঝির একটানা আওয়াজে রাত্রির নিস্তব্ধতা ঝিমঝিম করিতেছে—পৃথিবীতে আর যেন কোন শব্দ নাই। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোয় আমরা চারটি প্রাণী চারটি ছায়া লইয়া নীরবে বসিয়া আছি।

মাষ্টারবাবু বলিতেছেন—সেদিন এক কাণ্ড ঘট্‌লো যার ফলে W. T. ধরা ছেড়ে দিলাম, সেই সঙ্গে আমার প্রোমোশনের আশাও চিরকালের মতো গেল—এখন দেখুন বুড়ো বয়সে···কোথায় D. T. S. আর কোথায় এই সি ক্লাস স্টেশনের স্টেশনমাষ্টার।

প্রবোধ সহানুভূতিসূচক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—তখন বোধ করি রাত আটটা হবে, তার বেশি তো নয়ই। কিন্তু শীতের রাত নিঝুম হ'য়ে এসেছে, তার উপরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। ছোট স্টেশন ইতিমধ্যেই ছম্‌ছম্‌ করছে। বাসায় গিয়েছিলাম এক কাপ চা খেতে। ফিরে এসে দেখি যে আপ বর্ধমান লোকাল এসে থেমেছে। কয়েকজন যাত্রী নামলো, টিকিট দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্টেশন ঘরে ফিরবো এমন সময় দেখি কিনা যে একজন যাত্রী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প্লাটফর্মের আপে চলেছে। ও মশাই টিকিট দিয়ে যান, টিকিট দিয়ে যান। নাঃ, কথা কানেই তোলে না। এর মধ্যে গাড়ী ছেড়ে চলে গেল। আমি পিছন পিছন ছুটলাম, থামুন, থামুন, টিকিট কোথায় ? কে কার কথা শোনে ? সে সোজা হেঁটে হনহন ক'রে চলেছে। বুঝলাম W. T. না হ'য়ে যায় না। এমন বেয়াড়া যাত্রীও দেখিনি। আমাদের মধ্যে বোধকরি দশ গজের তফাত ! লোকটা প্লাটফর্ম পেরিয়ে গিয়ে মাটিতে নামলো, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালাবে মতলব। বলতে ভুলে গেছি

লোকটার হাতে ছিল একটা পুঁটুলি। আমিও প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে মাটিতে নামলাম। ভাবলাম গা ঢাকা দেবার জায়গা বটে, একে অন্ধকার তাতে এক বুক আগাছা, মাঝখানে ঘুরঘুট্টি পাকিয়ে মস্ত এক কাঁঠাল গাছ!

—লোকটা পালালো নাকি? এদিকে ওদিকে খুঁজছি, কোথাও নেই, ডাকাডাকি করছি, এমন সময়ে দেখি সেই পুঁটুলি, ঠিক কাঁঠাল গাছটার নীচেই। তবে পালায় নি, কাছেই কোথাও আছে! কিন্তু গেল কোথায়? এমন সময়ে মাথা তুলে দেখি কাঁঠাল গাছের ডালের উপরে বসে, অন্ধকারেও ভুল করিনি, সেই লোকটা! আমাকে দেখেই হি হি ক'রে হেসে উঠল! সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল! নেমে আসুন, এখনি নামুন! আপনাকে চালান না দিয়ে ছাড়ছিনে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই হি হি হাসি। ভাবছি গাছে উঠ্‌বো না কি? এমন সময়ে শুনতে পেলাম, আমাদের পয়েন্টস্‌ম্যান কিষণলাল চীৎকার করছে —বাবু ঘুমকে আইয়ে, উধার মৎ যাইয়ে। বুঝ্‌লাম বেটাকে দু'চার আনা দিয়ে বশ করেছে!

এবারে মাষ্টারবাবুর আওয়াজ পেলাম—ওহে ছোকরা ফেরো, ফেরো। তাকিয়ে দেখছি লণ্ঠন নিয়ে মাষ্টারবাবু আর কিষণলাল হন্‌হন্‌ ক'রে আসছেন!

—ওদিকে গাছের ওপরে সেই হি হি! এখন গা শিউরে উঠ্‌ছে তখন গা জ্বলে যাচ্ছিল। ভাবলাম ওরা আসবার আগেই লোকটাকে ধরতে হবে, কিন্তু তাকিয়ে দেখি লোকটাও নেই হাসিও থেমেছে। আবার পালিয়েছে।

—ইতিমধ্যে কিষণলাল এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, বললো, বাবু জিউ নিকল জায়েগা!

—প্রাণে মরবে নাকি ছোকরা!

কিষণলাল হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে আমাকে টেনে নিয়ে স্টেশন ঘরে ফিরলো, সঙ্গে মাষ্টারবাবুও ফিরলেন।

—মাষ্টারবাবু বললেন, ছোকরা, আর একটু হ'লে প্রাণে মরতে যে!

—কেন, একথা বলছেন কেন? ঐ সব পাজী W. T.-কে শাসন না করলে—মাষ্টারবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, বসো বসো সব বলছি। যা কিষণলাল বাবুর জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আয়! —তারপর গলা খাটো করে বললেন, কাকে ধরতে গিয়েছিলে? ও কি মানুষ?

—মানুষ নয়! তবে কি?

—ঐ যা হয়, রাতের বেলায় নামটা আর নাই করলাম।

—কি বলছেন আপনি?

—মাস্টারবাবু বললেন, আজ যে ১লা ডিসেম্বর তা মনে ছিল না, নইলে তুমি **newhand** তোমাকে মনে করিয়ে দিতাম। প্রত্যেক বছর ১লা ডিসেম্বর ঐরকম দেখা যায়।

—কেন ১লা ডিসেম্বর কেন?

—শোনা যায় যে, লোকটা ছিল কোন সদাগরী আপিসের কেরানী। এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতো। এক বছর ১লা ডিসেম্বর আপিসের সাহেব তাকে বরখাস্ত করে—সে পুঁটুলি হাতে ক'রে ট্রেন থেকে নেমে ওখানে পুঁটুলি রেখে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরে!

—তবে কি ও মানুষ নয়?

—এতক্ষণে বুঝলে নাকি?

—এতক্ষণেই বুঝলাম, কারণ এবারে এইমাত্র গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল, আরও একটু পরে বুঝলাম গলার কলার ভিজে উঠেছে। কিষণলাল চা নিয়ে এল!

এবারে চটকা ভাঙিয়া উঠিয়া মাষ্টারবাবু আমাকে বলিলেন, এবারে বুঝতে পারছেন কেন ১লা ডিসেম্বর তারিখটা মনে আছে! সেই থেকে মশাই **W.T.** ধরবার অভ্যাস ছেড়ে দিলাম! রাত্রি তো দূরের কথা দিনের বেলাতেও আর চেষ্টা করিনে। টিকিট দিল ভালো না দিলে কি করবো! প্রমোশনের জন্য প্রাণটা কে দেবে মশাই।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ! তারপরে তিনি প্রবোধবাবুর উদ্দেশ্যে বলিলেন—তাই বলছি, যতটা রয়সয় করবে, বাড়াবাড়ি কিছু নয়। আজ অন্ধকারে পিছন পিছন বাদামতলা পর্যন্ত গিয়ে ভালো করনি।

আড়চোখে দেখিলাম প্রবোধবাবু ও তাহার বন্ধুর মুখে আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের ছায়া মিলিতভাবে পড়িয়াছে।

চারজনেই নীরব। কতক্ষণ এইভাবে কাটিত জানি না—এমন সময়ে ঠনক ঠনক করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল! প্রবোধবাবু টেলিফোনে কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—রামশরণ—ট্রুয়েলভ আপ, সিগন্যাল দে!

এতক্ষণ পরে আমরা পুনরায় বাস্তবজগতে ফিরিয়া আসিলাম।

ভৌতিক চক্ষু

ইংলণ্ডের বার্কশায়ারের জন ফষ্টারের বালিকা কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে ভয়াবহ চাঞ্চল্য ইংলণ্ড তথা সমগ্র ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজকে আন্দোলিত করিয়াছিল তাহা চরমে পৌছিবার পূর্বেই সহসা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। কাজেই ফষ্টার কন্যার ইতিহাস তখন আর কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু সামগ্রিক মনোযোগের অন্তরালে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাসের রক্তিম প্রবাহ শোচনীয় পরিণতি পর্যন্ত নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়া যায়। যাহারা এই কাহিনীর আদ্যন্ত জানে তাহাদের বিস্ময় ও ভীতির অন্ত ছিল না। আর তখন যদি বিশ্বযুদ্ধ না বাধিয়া যাইত তাহা হইলে ঘটনাটি ইউরোপীয় সমাজে ভয়াবহতার এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিত সন্দেহ নাই। বিশেষ সদ্য সদ্য এই কাহিনীর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করাতে সংশ্লিষ্ট পাত্র-পাত্রীর সকলের নামধাম প্রচার করাতে যথেষ্ট আপত্তির কারণ ঘটিতে পারিত। কিন্তু এখন সে সব বাধা অপসারিত, ঘটনা পুরাতন, প্রধান পাত্র-পাত্রীগণ মৃত, কাজেই এতদিন পরে বিষয়টি অসঙ্কোচে বিবৃত হইতে পারে। পুরাতন হওয়া সত্বেও কাহিনীর পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ইহার রহস্য ও নিদারুণত্ব এতটুকু হ্রাস পায় নাই।

মিঃ জন ফষ্টার একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। বাল্যকালে প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিয়া তিনি এক ইংরেজ সদাগরী আফিসে শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রবেশ করেন। তাঁহার ব্যবসা বুদ্ধি ছিল, অধ্যবসায় ছিল। এমন সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যায়। তখন তিনি পাটের চালান দিয়া এবং অন্যান্য প্রকার ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জন করেন। যুদ্ধান্তে তিনি ক্লাইভ ষ্ট্রীটে জন ফষ্টার এণ্ড কোং নামে নিজ ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন। এই সময় তিনি একটি পার্শী মহিলাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মে। কন্যাটির নাম রাখা হয় সোফিয়া। সোফিয়ার বয়স যখন দুই তিন, তখন

তাহার মাতার মৃত্যু হয়। পত্নীর মৃত্যুতে ফষ্টারের মনে বৈরাগ্য জন্মায়, সে সমস্ত ব্যবসা বিক্রয় করিয়া দিয়া কন্যাকে লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং বার্কশায়ারের অন্তর্গত মিলথর্প নামে ছোট একটি গ্রামে বাড়ী ও জোতজমি কিনিয়া স্থায়ী হইয়া বসে। কন্যাটিকে যত্নে লালনপালন করা, উত্তম শিক্ষাদান করা—ইহাই ফষ্টারের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। কন্যাটি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সুন্দরী, তেমনি সুশীলা, বিশেষ শিক্ষালাভ করায় তাহার আগ্রহ লক্ষ্য করিবার মতো ছিল। তাহাকে গ্রামের সকলেই ভালোবাসিত, এবং অনেকটা তাহারই আকর্ষণে (ফষ্টারের নিজেরও আকর্ষণ ছিল) গ্রামের লোকে ফষ্টারের বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইত। মোটকথা পাঁচ বৎসরের সেই মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা ছিল।

এমন সময়ে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। ফষ্টারের বাড়ীর চারপাশে সবজি ক্ষেত ছিল। সেই সবজি ক্ষেত হইতে পাখী তাড়াইবার উদ্দেশ্যে ফষ্টার ছর্‌রা-গুলি ছুঁড়িতেছিলেন। একটি ছর্‌রা-গুলি লাগিয়া সোফিয়ার বাম চক্ষুটি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তখন তাহার সেখানে আসিবার কথা নয়, সে কখন কোথা হইতে আসিল যখন সকলে পরস্পরকে শুনাইতেছে তার অনেক আগেই তাহার চক্ষুটি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

এই দুর্ঘটনায় ফষ্টার একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এত বড় আঘাত জীবনে তিনি পান নাই, স্ত্রীর মৃত্যুতেও নয়। এমন সময়ে তাঁহার এক ডাক্তার বন্ধু দেখা করিতে আসিলেন, ভারতবর্ষে থাকিতে তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, ফষ্টার, এই ক্ষতি অপূরণীয় নয়, আগেকার দিন হইলে অবশ্য অপূরণীয় হইত, কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এ সব রোগ চিকিৎসা সাধ্য হইয়াছে। তিনি জানাইলেন যে "ব্লাড" ব্যাঙ্কে যে প্রক্রিয়ায় রক্ত অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়, সেই প্রক্রিয়ায় সদ্যমৃত ব্যক্তিদের অক্ষিগোলক অবিকৃত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে ফষ্টার অর্থব্যয় করিতে রাজি থাকিলে তিনি ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছেন।

ফষ্টার বলিলেন, মহাশয়, অর্থব্যয়ে আমি কুন্ঠিত নই।

তখন ডাক্তারটি বলিলেন যে আমি লণ্ডনে যাইতেছি। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে কন্যাসহ গিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই ফষ্টার সোফিয়াকে লইয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। উক্ত ডাক্তার, নাম বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ডাঃ রিচার্ডস তাহাদের লইয়া শহরের একজন প্রধান চক্ষু চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হইলেন। ডাঃ মেরিগোল্ড অন্যতম শ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসক, আবার সেই সঙ্গে "চক্ষু ব্যাঙ্কের" একজন ডিরেক্টারও বটেন। তিনি সোফিয়ার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচারের দ্বারা নষ্ট চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া "চক্ষু ব্যাঙ্ক" হইতে একটি নূতন অক্ষিগোলক পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দুই চার দিনের মধ্যেই সোফিয়ার বাম চক্ষুটি উৎপাটিত হইল এবং সে স্থলে সদ্যমৃত এক ব্যক্তির অক্ষিগোলক আরোপিত হইল। ডাক্তারেরা বলিল—মিঃ ফষ্টার, আর ভয়ের কারণ নাই, আপনি কন্যাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। কয়েক-দিনের মধ্যেই পুরাতন চক্ষুতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে সোফিয়া পূর্ববৎ দেখিতে পাইবে, প্রথম কয়েকদিন কিছু কিছু অসুবিধা হয়, তবে তাহাতে চিন্তিত হইবেন না। ফষ্টার ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া সোফিয়াকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পাঁচ সাত দিন পরে সত্য সত্যই সোফিয়া বাম চক্ষুতে নূতন দৃষ্টি লাভ করিল। সেদিন ফষ্টারের কি আনন্দ! তিনি সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের লোকদের স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া নাচ গান ও অগ্ন্যুৎসবের আয়োজন করিলেন। গ্রামের সকলেই সোফিয়াকে ভালোবাসিত, তাহারাও আনন্দিত হইল। কিন্তু এ হর্ষের কারণ বেশী দিন থাকিল না। নূতন চক্ষু দৃষ্টিলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়ার আচরণে, দৃষ্টিতে এবং কথাবার্তায় পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু হইল। তাহার মুখের সে লাবণ্যও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল।

এখন তাহার মুখ দেখিলে মনে হয়, মুখের হাব ভাব যেন বয়স্ক ব্যক্তির, শুধু তাই নয়, সে ব্যক্তিও আবার যেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তাহার নূতন চক্ষুটি পুরাতন অপেক্ষা আকারে বড়, কেমন যেন জটিলতায় পূর্ণ, আর সর্বদা রক্তাভ! হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়! মনে হয় বালিকার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন এক একচক্ষু শয়তান বাসা বাঁধিয়া একটি ঘুলঘুলি পথে সব যেন দেখিতেছে, সকলের গতিবিধি যেন পর্যবেক্ষণ করিতেছে। অথচ অপর চক্ষুটি করুণাময়ী বালিকার, তাহাতে আসল সোফিয়ার প্রকৃত পরিচয়।

ক্রমে সোফিয়া সম্বন্ধে আরও নানারূপ অবাঞ্ছিত তথ্য লক্ষ্যগোচর হইতে লাগিল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত সে যেন সর্বদা কাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। কিংবা মনে হইত ঐ নূতন চক্ষুটি যেন তাহার চালক হইয়াছে আর অসহায় বালিকা তাহারই নির্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কাহার সন্ধানে! কি ভয়াবহ ঐ চক্ষুর দৃষ্টি—আর তাহারই ফলে কি নিষ্ঠুর, কি প্রতিজ্ঞা-কঠোর তাহার মুখের ভাব! তাহাকে একাকী অবস্থায় হঠাৎ দেখিলে চমকিয়া ওঠা অসম্ভব নয়।

ক্রমে আরও সব তথ্য প্রকাশ পাইল। ফষ্টারের বহু সংখ্যক গৃহপালিত হাঁস মুরগী ও খরগোস ছিল—আর সেগুলি ছিল বালিকা সোফিয়ার খুব প্রিয়। একদিন সকালবেলা ফষ্টার আবিষ্কার করিলেন যে গোটাকয়েক হাঁস-মুরগী এবং একটি খরগোস ছিন্নকণ্ঠ হইয়া পড়িয়া আছে। প্রথম তিনি ভাবিলেন এ কোন ধূর্ত শিয়ালের কীর্তি। কিন্তু পরে তাঁহার মনে হইল—শিয়ালে মৃতদেহ ফেলিয়া যাইবে কেন? তবে কে করিল!

প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া ফষ্টার পশুপক্ষীর নূতন নূতন মৃতদেহ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন একি অনৈসর্গিক উৎপাত। কিন্তু শেষে একদিন রহস্য উদ্ঘাটিত হইল, না হইলেই বোধ করি ভালো ছিল। তিনি সেদিন রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিয়া বসিয়া ছিলেন, খোলা জানালার কাছে, সম্মুখেই উঠানের মধ্যে গৃহপালিত পশুপক্ষীর জালে-ঘেরা সুবৃহৎ খাঁচা। হাঁসের পাখার ধড়ফড় শব্দে সচকিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে সোফিয়া খাঁচার দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং মুহূর্ত পরেই আরও দেখিলেন যে একটি হাঁস ছিন্নকণ্ঠ হইয়া ভূতলে পড়িল। ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল! একি তাঁহার করুণাময়ী কন্যার কাণ্ড! সে কি মানবী হইতে শয়তানী হইয়া গিয়াছে? কেন? কাহার অভিশাপে?

কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না, তিনি ছুটিয়া খাঁচার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ পিতাকে দেখিয়া সোফিয়া অপ্রস্তুত হইয়া ঘরের দিকে ছুটিল কিন্তু তৎপূর্বে ফষ্টারের দিকে এমন একটা হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে কন্যাবৎসল পিতার মনেও আর সন্দেহ রহিল না যে কোন ক্রূরকর্মা পৈশাচিক আত্মা ঐ অসহায় বালিকার মস্তিষ্কে বাসা বাঁধিয়াছে। তিনি পরদিনই ডাঃ রিচার্ডসকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া অবিলম্বে একবার আসিতে অনুরোধ করিয়া তারবার্তা প্রেরণ করিলেন।

পরদিন ডাঃ রিচার্ডস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন ফষ্টারের বাড়ীতে প্রবেশ করেন তখন ফষ্টার ও তাঁহার কন্যা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ছিলেন। ফষ্টার তাঁহাকে দেখিবার আগেই রিচার্ডস সোফিয়ার নজরে পড়েন আর সঙ্গে সঙ্গেই সোফিয়া মহা আক্রোশে তাঁহার দিকে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার মনের অবস্থা যত ভয়ানকই হউক না কেন সে বালিকা বই তো নয়? ফষ্টার ও রিচার্ডস উভয়ে মিলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং তাহাকে গৃহান্তরে পাঠাইয়া দিলেন।

সোফিয়া অন্য গৃহে গেলে কন্যার দুর্ব্যবহারের জন্য ফষ্টার বন্ধুর নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু রিচার্ডস বলিলেন—এজন্য আপনি বিচলিত হইবেন না। এই ব্যবহারের জন্য আপনি বা আপনার কন্যা কেহই দায়ী নন। কোথাও কিছু একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে! হয়তো ঐ অস্ত্রোপচারের সঙ্গেই ইহার যোগ রহিয়াছে। যাহা হউক আমি এখনই ডাঃ মেরিগোল্ডকে সব জানাইতেছি।

ফষ্টার শুধাইল—আপনার সঙ্গে কি ডাঃ মেরিগোল্ডের এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল?

রিচার্ডস—আপনার তার পাইয়া আমি ডাঃ মেরিগোল্ডের কাছে গিয়া সমস্ত বিষয় বিবৃত করি। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তায় নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, আপনি যান। আর কোন বাড়াবাড়ি দেখিলে আমাকে সত্বর জানাইবেন।

তারপরে রিচার্ডস বলিলেন, এখনই যাহা দেখিলাম তার চেয়ে ভয়ানক আর কি হইতে পারে? ঐ হতভাগ্য ক্ষুদ্র জীবটির ঘাড়ে যেন খুন চাপিয়াছে। এমন যে কি করিয়া হইল কে বলিবে।

—আর তাহার চোখটি দেখিলেন কি?

—মুহূর্ত মধ্যে যেটুকু দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি ও তাহার স্বাভাবিক চোখ নয়। সমস্তই কেমন রহস্যময় বোধ হইতেছে। যাহা হউক, আমি ডাঃ মেরিগোল্ডকে সব জানাইয়া এখনই তার করিয়া দিতেছি।

রিচার্ডস একটু শান্ত হইলে ফষ্টার তাহাকে সোফিয়ার হিংস্র আচরণ সম্বন্ধে আনুপূর্বিক নিবেদন করিলেন। রিচার্ডস বলিলেন, ডাঃ মেরিগোল্ডের পরামর্শ না জানা পর্যন্ত এ সমস্ত সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। তবে যতটা সম্ভব সোফিয়াকে চোখে চোখে রাখিতে হইবে। আর আশা করিতেছি আগামী কল্যই ডাঃ মেরিগোল্ডের নিকট হইতে একটা চিঠি বা তার পাইব।

কিন্তু পরদিন দেখা গেল যে চিঠি বা তারের বদলে স্বয়ং ডাঃ মেরিগোল্ড আসিয়া উপস্থিত। তখন রিচার্ডস ও ফষ্টার বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে মেরিগোল্ডকে ঢুকিতে দেখিয়া দুইজনে বিস্মিত আনন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মেরিগোল্ড যথাবিধি প্রত্যুত্তর দিয়া সোফিয়ার বিবরণ জানিতে চাহিলেন।

ফষ্টার বলিলেন—সে বোধ হয় পাশের ঘরেই আছে।

এমন সময় এরূপ এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিল যাহা পূর্বদিনের ঘটনার চেয়েও ভয়ঙ্কর। বালিকা সোফিয়া উনুন খোঁচাইবার লৌহদণ্ড বা পোকার হাতে লইয়া "ঐ আমার হত্যাকারী" বলিয়া মেরিগোল্ডের দিকে ধাবিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে রিচার্ডস ও ফষ্টার তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লৌহদণ্ড কাড়িয়া না লইলে মেরিগোল্ডের অবস্থা কি হইত তাহা ভাবিতেও ভয় করে।

ফষ্টার বলিল—আর উহাকে ছাড়া রাখা উচিত নয়—

এই বলিয়া কন্যাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া ঘরটি অর্গল বন্ধ করিয়া দিল—তারপরে ফিরিয়া আসিয়া ডাঃ মেরিগোল্ডের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

কিন্তু ডাঃ মেরিগোল্ড রিচার্ডস ও ফষ্টার উভয়কে বিস্মিত করিয়া দিয়া বলিলেন যে—মহাশয় আমারই উচিত আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা!

—কেন?

—তবে সব কথা বলি শুনুন! যাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমাকে ঠিক দোষী বলা চলে না—কিন্তু আমার আরও ভাবিয়া কাজ করা উচিত ছিল।

এই বলিয়া তিনি যাহা প্রকাশ করিলেন তাহা যেমন ভীতিজনক, তেমনি বিস্ময়কর।

ডাঃ মেরিগোল্ড বলিলেন—এই চক্ষুটি স্মিথ নামে একজন হত্যাকারীর, তাহার ফাঁসির হুকুম হয়—এবং প্রধানতঃ তাহা আমার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই হয়। ফাঁসির দু'দিন আগে কি মনে করিয়া—সে নির্দেশ দিয়া যায় যে মৃত্যুর পরে তাহার বাম চক্ষুটি যেন 'চক্ষু ব্যাঙ্কে' দান করা হয়। সেই নির্দেশ অনুসারে তাহার চোখটি ব্যাঙ্কে আসে এবং রক্ষিত হয়। সোফিয়ার জন্য যখন চোখ সন্ধান করিতে আপনারা যান, তখন ঐ চোখটিই ছিল সব চেয়ে সদ্য আনীত। তাই আমি ঐ চোখটি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিই।

ডাঃ মেরিগোল্ড বলিতেছেন—তার দুই তিন দিন পরেই কোন সূত্রে স্মিথের একটি ডায়েরী আমার হস্তগত হয়। ডায়েরীখানি আমার বিরুদ্ধে হিংসাময়

উক্তিতে পূর্ণ। আমার সাক্ষ্যে তাহার ফাঁসি হয় বলিয়া আমার উপরে যে জাতক্রোধ হয়—তেমন ক্রোধ একমাত্র নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রীর দ্বারাই সম্ভব। সে লিখিয়াছে যে, আমাকে হত্যা করিতে না পারিয়া সে নিষ্ফল আক্রোশ লইয়া মরিতেছে। তাহার ব্যর্থকামনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সে চোখটি দিয়া যাইবে—যে ব্যক্তি পরে উহা গ্রহণ করিবে সে যেন তাহার অভিলাষ পূর্ণ করে—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে মরিয়াছে!

ডাঃ মেরিগোল্ড আরও বলিলেন—এখন দেখিতেছি তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রথমে সোফিয়া যে রিচার্ডস-কে হত্যা করিতে গিয়াছিল—তাহা আর কিছুই নহে, রিচার্ডসকে আমি বলিয়া ভুল করিয়াছিল। তারপরে আমার উপরে যে আক্রমণ হয়—তাহা তো আপনারা জানেন। ভাগ্যি সোফিয়া বালিকা তাই তাহাকে সহজে নিরস্ত করা গেল। কিন্তু এমন যে সম্ভব—অর্থাৎ এক মৃত ব্যক্তির চক্ষু তাহার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার জের যে বহন করিতে সক্ষম, বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করে না। কিন্তু এরূপ ঘটনা যে মোটেই অসম্ভব নয়—তাহা তো চোখে দেখিলাম।

ব্যাকুলভাবে ফষ্টার শুধাইলেন—এখন ঐ শয়তানের হাত হইতে আমার কন্যাকে উদ্ধার করিবার কি উপায়?

—তাহাই তো ভাবিতেছি।

এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে সোফিয়ার আর্তনাদ উঠিল। দরজা খুলিয়া সকলে সবেগে প্রবেশ করিয়াই বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইল। এবং মুহূর্ত পরেই ফষ্টার কন্যার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সকলে দেখিল সোফিয়ার বাম চক্ষুতে একটি Poker আমূল বিদ্ধ—সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে—আর, 'বাবা আমাকে বাঁচাও! বাবা, বিষম কষ্ট' বলিয়া চিৎকার করিতেছে।

নূতন চক্ষু লাগাইবার পরে সোফিয়া এই প্রথম 'বাবা' সম্বোধন করিল—এতদিনের মধ্যে একবারও 'বাবা' বলিয়া ফষ্টারকে ডাকে নাই।

এতদিন পরে হতাশ হইয়া শয়তান বোধকরি তাহাকে ছাড়িয়া গেল এবং যাইবার সময়ে সোফিয়ার অকৃতকার্যতার দণ্ডস্বরূপ চক্ষুটি হরণ করিয়া গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোফিয়ার প্রাণহীন দেহ পিতার কোলে শান্তভাবে শায়িত হইল। ইহাই সেই অদ্ভুত 'ভৌতিক চক্ষুর' সাকুল্য বিবরণ—এখন প্রথম প্রচারিত হইল।

পুরন্দরের পুঁথি

জীবনে পুরন্দরের একমাত্র বিলাস ছিল বই পড়িবার অভ্যাস। ওটাকে একটা বাতিক বলাই উচিত। সে রাশি রাশি বই কিনিত, সব যে পড়িত এমন বলিতে পারি না, কারণ এক জীবনে তত বই পড়িয়া ওঠা সম্ভব নয়। বই কিনিত, কতক পড়িত, বাকী অমনি পড়িয়া থাকিত, সে বলিত যে এমন সময় আসা অসম্ভব নয় যখন বই কিনিবার সামর্থ্য থাকিবে না। তখনকার জন্য ওগুলো জমা থাকিতেছে। তাহার শয়ন ঘরটির মেঝে হইতে ছাদ পর্যন্ত রাশি রাশি বইয়ে ভরিয়া গিয়াছিল। ঐ বইয়ের মধ্যেই শয়ন করিত পুরন্দর। বিছানাতেও বইয়ের স্তূপ। বইগুলো একটু সরাইয়া দিয়া রাত্রে শুইত। যখন শুইবার জায়গা থাকিত না, তখন ঘরে আর একখানা তক্তপোষ আনিয়া নূতন শয্যা প্রস্তত করিত। এমনিভাবে সমস্ত ঘরটি তক্তপোষে ভরিয়া গিয়াছিল।

সংসারে তাহার কেহ ছিল না। লোকে বিবাহ করিতে বলিলে সে বলিত, সময় কোথায়? সে বলিত বই আর বউ একসঙ্গে অচল, তাই যা আছে তার সঙ্গে আর নূতন সমস্যা যোগ করা উচিত নয়। এদিকে তাহার বিবাহের বয়সও অনেকটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বোধকরি সে নিজেও মনে মনে বিবাহের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে বই পড়ে।

কলিকাতা থেকে দূরে একটি গ্রামে পুরন্দরের বাস, আমিও সেই গাঁয়ে থাকি—এক পাড়ায় বলিলেই চলে। মাঝে মাঝে সে কলিকাতা চলিয়া যায়, নূতন বই সংগ্রহ করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে। সে বলে যে নূতন বই পড়ে ছাত্ররা এবং পণ্ডিতরা, গ্রন্থবিলাসীদের জন্যে পুরাতন বই। সে বলে যে, পুরাতন বইয়ের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তাতে করিয়া পড়া বেশ জমিয়া ওঠে, মনে হয় যেন দু'জনে বসিয়া পড়িতেছি।

পুরন্দরের দৃষ্টান্তে আমারও বই পড়ার নেশা জমিয়া উঠিয়াছিল, তবে তফাত ছিল এই যে, সে কিনিয়া পড়িত, আমি তাহার নিকট চাহিয়া লইয়া

পড়িতাম। আরও একটু তফাত ছিল, আমার জীবনে আরও পাঁচটা কাজ ছিল, তার মতো বই পড়াই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না।

এই বই পড়ার সূত্রে তার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল—গাঁয়ের আর কারো সঙ্গে সে বড় মিশিত না। কতবার তার বাড়ীতে গিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি যে সে জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের ঐ পাহাড়গুলার দিকে তাকাইয়া আছে—কোলের উপর একখানা খোলা বই, আর চারপাশে স্তূপীকৃত পুস্তকের প্রাচীর।

আগেই বলিয়াছি যে, কলিকাতা হইতে দূরে আমাদের বাস। এবারে আর একটু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। ছোটনাগপুরের ছোট একটি শহরে আমরা থাকি, শহরটি এত ছোট যে, বড় গ্রাম বলিলেই চলে। পুরন্দরের বাড়ীটি শহরের একপ্রান্তে, তারপরেই ধান ক্ষেত আরম্ভ হইয়াছে—ধান ক্ষেতের পরে সুবর্ণরেখা নদী—নদীর ওপারে পাহাড় আর বন, বন আর পাহাড়।

পুরন্দর বলে, বই পড়া যার জীবনের লক্ষ্য—তার আদর্শ বাসস্থান এইরকম হওয়া উচিত।

একদিন সকালবেলা পুরন্দরের চাকর আসিয়া আমাকে বলিল যে, বাবু একবার আমাকে যাইতে বলিয়াছেন।

বুঝিলাম যে কিছু নূতন বই আসিয়াছে। ঐরকম উপলক্ষ্য ছাড়া আমার বড় ডাক পড়ে না।

পুরন্দরের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখি যে, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। দেখিলাম প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স হইতে ধুলা ঝাড়িয়া পুরন্দর বই বাহির করিতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—কাল রাত্রে নিয়ে এলাম।

—কলকাতা গিয়েছিলে নাকি?

—হ্যাঁ, কদিন আগে এক লটে অনেক বই বিক্রী হচ্ছে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতা গিয়েছিলাম, কাল শেষ রাতে ফিরেছি।

—কি বই?

সে বলিল—পাঁচরকম মিশানো আছে। এক সাহেব এদেশ থেকে বাস তুলে দিয়ে বিলেতে ফিরছে—তারই বই। লোকটা খুব পণ্ডিত, চীনে ভাষাও জানে—

এই বলিয়া বিচিত্র হরপে ছাপা একখানা জীর্ণ বই টানিয়া বাহির করিল।

অক্ষর যখন চিনি না কাজেই চীনা ভাষা হইতে বাধা নাই—হিব্রুভাষা বলিলেও আমার আপত্তি করিবার কারণ ছিল না।

সে বলিল—মাত্র পাঁচশো টাকায় পাওয়া গেল—খুব সস্তায় পেয়েছি।

ভাবিলাম হবেও বা।

সেদিনই বিকালবেলা ক'দিনের জন্য আমাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল, কাজেই পুরন্দরের চীনা ভাষার পাঠোদ্ধার কতদূর হইল জানিতে পারি নাই।

পাঁচ ছ' দিন পরে ফিরিয়া একদিন পুরন্দরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।—ওহে, অ-চীনা ভাষার কিছু যদি বই থাকে দাও, নিয়ে যাই।

পুরন্দর সে প্রসঙ্গের উত্তর না দিয়া বলিল—বসো, একটা কথা আছে।

চাহিয়া দেখি তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

শুধাইলাম—কি ব্যাপার? অসুস্থ নাকি?

সে বলিল—আজ ক'দিন রাতে ঘুম হচ্ছে না।

আমি বলিলাম—ঘুমের দোষ কি? রাত জেগে পড়লে—

বাধা দিয়া বলিল—ঠিক উল্টো, রাতে পড়তে পারছি না, বই খুলে বসলেই ঘুমিয়ে পড়ি, আর অমনি দুঃস্বপ্ন দেখি—

দুঃস্বপ্ন? এমন কথা তো তাহার মুখে আগে শুনি নাই, বলিলাম—স্বপ্ন সবাই দেখে, তার জন্যে আবার দুশ্চিন্তা কেন?

সে বলিল—স্বপ্ন সবাই দেখে, আমিও দেখেছি, কিন্তু এ সে রকম নয়, কিছু বিশেষত্ব আছে।

সে বলিতে লাগিল—একই স্বপ্ন আজ ক'দিন দেখ্‌ছি।

—কি রকম?

—একটা অদ্ভুত চেহারার লোক ঘরে ঢুকে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—কি রকম চেহারা?

—চোখ ছোট, নাক চেপ্টা, চোয়াল উঁচু, সামান্য কটা দাড়ি আছে, মাথায় জটা।

—ওসব তোমার কল্পনার বিকার।

—কল্পনা আসবে কোথা থেকে? ওরকম চেহারার বর্ণনা শীগ্‌গীর পড়িনি।

—ক'দিন দেখছ?

—যেদিন কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পর থেকেই। প্রথমে কিছু মনে হয়নি, কিন্তু পর পর কদিন দেখবার পরে কেমন যেন ভয়ের মতো ধরেছে। অনেকবার ভেবেছি রাতে ঘুমোবো না, বই পড়েই কাটিয়ে দেবো—কিন্তু তা হবার জো নেই, বই খুলে বসবামাত্র চোখ জড়িয়ে আসে—আর ঘুমোবামাত্র সেই একই স্বপ্ন। সেই অদ্ভুত চেহারা। কি তার দৃষ্টি, যেন জিজ্ঞাসার আগুন বের হচ্ছে চোখ দিয়ে।

তারপর সে বলিল—তুমি আমার এখানে এসে রাতে ঘুমোও না?

অনুরোধটা করিবামাত্র সে যেন লজ্জা অনুভব করিল, বলিল—না, না, তার দরকার নেই।

আমি বলিলাম, তোমার দরকার না থাকতে পারে, আমার আছে। রাতে এখানে থাকলে তোমার নূতন চালানের বইগুলো দেখতে পারবো।

লজ্জার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি মনে করিয়া সে বলিল—মন্দ নয়, পাশের ঘরটা তোমার জন্য ঠিক ক'রে রাখবো যতক্ষণ খুশি প'ড়ো।

রাতে পুরন্দরের বাড়ীতে শুইতে আসিলাম। পুরন্দরের পাশের ঘরে আমার শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছে—দুই ঘরের মাঝখানে দরজা, দরজাটা খোলা থাকিবে। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। পুরন্দর একখানা বই লইয়া বসিল, আমি খানকতক বই লইয়া আমার শয্যার উপরে উঁচু করিয়া বালিশে হেলান দিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ না যাইতেই পুরন্দরের নাসিকা গর্জনে বুঝিলাম সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি পড়িতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পড়িবার পর রাত কত হইয়াছে দেখিবার জন্য দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাইলাম—রাত বারোটা। চোখের দৃষ্টি নামাইতেই জানালার দিকে তাকাইলাম—মনে হইল জানালার বাহিরে একটা যেন লোক। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল—সামান্য জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। চোর নাকি? কিন্তু চাঁদের আলোর সঙ্গে ঘরের আলো মিলিয়া পরক্ষণেই তাহার চেহারা ভালো করিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম—এ যে পুরন্দরের বর্ণিত চেহারা। চোখ ছোট, নাক চেপ্‌টা, চোয়াল উঁচু, মাথায় একরাশ জটা। হঠাৎ দেখিয়া ভুটিয়া বা নেপালী মনে হয়।

কে? কে? বলিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কেহ কোথাও নাই। আমার চীৎকারে পুরন্দর জাগিয়া উঠিল—আমার ঘরে ছুটিয়া আসিল।

বলিলাম—তুমি উঠ্‌লে কেন ?

—আবার সেই স্বপ্ন।

সে শুধাইল—তুমি এখানে কেন ?

—বাইরে একটা যেন লোক দেখ্‌লাম।

—চোর ?

—কেমন ক'রে বলবো ?

—চলো দেখে আসি।

দু'জনে আলো লইয়া বাহিরে আসিয়া জানালার কাছে উপস্থিত হইলাম—কোথাও কেহ নাই। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের এই যে, ভিজা মাটিতে কোনরূপ পায়ের চিহ্ন নাই। অথচ মাটি যে-রকম নরম, পায়ের ছাপ না পড়িয়াই পারে না।

আমার বিস্ময় দেখিয়া পুরন্দর বলিল—কেউ আসেনি, তোমার চোখের ভ্রম।

চুপ করিয়া রহিলাম, লোকটার চেহারা বর্ণনা করিলাম না, করিলে পুরন্দরের ভীতি বাড়িত বই কমিত না।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন রাত্রে আবার শুইতে আসিলাম। এবারে পুরন্দরের অনুরোধের জন্য আর অপেক্ষা করি নাই—প্রবল কৌতূহল আমাকে আসিতে বাধ্য করিল।

পাশের ঘরে পুরন্দর ঘুমাইতেছে, আমি বসিয়া পড়িতেছি, হাতের কাছে একটা বিজলি বাতি। দেওয়াল ঘড়ির বারোটা বাজার শব্দে চমক ভাঙিল, চোখ আপনি জানালার দিকে পড়িল—সেখানে সেই পূর্বদৃষ্ট মূর্তি। বিজলি বাতির পিচকারি ফেলিলাম, এক মুহূর্তের জন্য মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া মিলাইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে পুরন্দর জাগিয়া উঠিয়া আমার ঘরে ঢুকিল।

—কি ব্যাপার ?

সে বলিল—সেই স্বপ্ন, সেই লোক। উঃ, কি তার চাহনি। নাঃ আর পারি না, বলিয়া আমার বিছানার উপরে বসিয়া পড়িল।

পরদিন সকাল বেলায় তাহাকে সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম—বিশেষ করিয়া জানাইলাম যে তাহার স্বপ্নে দেখা লোকের এবং আমার জাগরণে দেখা লোকের চেহারা একই রকম! বলিলাম—আমি যাকে জেগে দেখেছি—তুমি তাকেই ঘুমিয়ে দেখ্‌ছ।

সে বলিল, তাহার স্বপ্নে-দেখা ভ্রান্ত নয়। আমি বলিলাম—আমার জেগে দেখাও অভ্রান্ত। কাজেই সমস্যা সমাধার দিকে না গিয়া জটিলতর হইয়া উঠিল—কোন সমাধান না পাইয়া দু'জনে নীরবে বসিয়া রহিলাম।

এইভাবেই চলিতেছিল, কতদিন চলিত এবং পরিণাম কি হইত জানি না, এমন সময়ে ঘটনার মোড় ঘুরিয়া গেল। কিন্তু তার আগে পুরন্দর ও আমার অবস্থা বর্ণনা করা দরকার। পুরন্দরের শরীর ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল; তাহার শরীর কৃশ এবং গায়ের রঙ ফ্যাকাসে হইয়া আসিল। রাতে সে ঘুমাইতে পারিত না কিংবা ঘুমাইবামাত্র স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিত, তারপরে আর তাহার ঘুম আসিত না। আমি পাশের ঘরে শুইতাম এবং প্রতি রাত্রে বারোটা বাজিবামাত্র পূর্বদৃষ্ট সেই লোকটিকে জানালার বাহিরে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সে লোকটা রক্তমাংসের মানুষ বা ছায়ামাত্র বুঝিতে পারিতাম না, কেননা ঐ চোখের দেখা ছাড়া তাহার আর কোন প্রমাণ পাইবার উপায় ছিল না—পুরন্দরের স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি আর আমার জাগরণে দৃষ্ট ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব জানি না, কখনো জানিতেও পারিতাম কিনা সন্দেহ। এমন সময়ে ঘটনা একটা মোচড় খাইল।

একদিন সন্ধ্যার আগে পুরন্দর ও আমি বারান্দায় বসিয়া আছি—এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরন্দরকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—বাবু, আপনার কাছে এলাম।

পুরন্দর বলিল—কেন রায় মশায় ?

রায় মশায় বলিল—এই সেদিন আপনাকে যে বইগুলো বিক্রী করেছি—সেগুলো একবার দেখতে চাই।

তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিলাম যে, লোকটি পুরাতন পুস্তকের ব্যবসায়ী। পুরন্দর তাহার নিকট হইতে বই কিনিয়া আনে। পুরন্দরের কাছে তাহার কথা অনেকবার শুনিয়াছি—এই প্রথম তাহাকে চোখে দেখিলাম।

পুরন্দর বলিল—সে-সব বই এখনো খুলিনি, যেমন এনেছি, তেমনি আছে—চলুন দেখবেন! কিন্তু ব্যাপার কি? এজন্য আপনাকে এতদূর আসতে হ'ল দেখে অনুমান করছি গুরুতর কিছু ঘটেছে।

রায় মশায় বসিতে বসিতে বলিল, গুরুতর তো বটেই আর ভারি আশ্চর্য! বইগুলো ছিল এক সাহেবের, বিলেত যাওয়ার সময়ে তার

কাছ থেকে কিনেছিলাম। এসব কথা আপনি জানেন—বিক্রী করবার সময়েই বলেছি।

তারপর সে বলিল—আপনার কাছে বইগুলো বেচে দেবার পর থেকেই এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছি—

স্বপ্নের নামে আমাদের কৌতূহল বাড়িল—বলিলাম—কি স্বপ্ন?

—একটা অদ্ভুত চেহারার লোক এসে যেন একখানা বই চায়।

—কি বই?

—তার কথা কি ছাই বুঝতে পারি। তবে তার ভাবে ভঙ্গীতে বুঝি যে, একখানা বই চাইছে। যে জায়গায় বইগুলো ছিল হাত দিয়ে দেখায়। এমন অনেক কয়দিন ধরে স্বপ্ন-দেখা চলছে—সেই একই ঘটনা, সেই একই লোক। ব্যাপারটা হয়তো স্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দিতাম—কিন্তু কাল বিলেত থেকে সাহেবের এক চিঠি পেলাম। সাহেব লিখেছে যে, বইগুলোর সঙ্গে একখানা তিব্বতী ভাষায় হাতে লেখা পুঁথি ভুল ক'রে সে বিক্রী ক'রে দিয়েছে। সেই পুঁথিখানা যেন অবশ্য অবশ্য সাহেবকে এয়ারমেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই বলিয়া সে সাহেবের চিঠিখানা বাহির করিল—দেখিলাম সাহেব চিঠিতে রায় মহাশয়ের কথিত বিষয় লিখিয়াছে বটে।

পুরন্দর বলিল—চলুন ভিতরে গিয়ে খুঁজবেন।

তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, চাকরে একটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া আনিল। আমরা তিনজন নূতন-আনা পুঁথির স্তূপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। রায় মহাশয় পুঁথির রাশি ঘাঁটিতে লাগিল!

অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া রায় মহাশয় জীর্ণ প্রাচীন কাগজে লেখা অজ্ঞাত হরফের একখানা পুঁথি বাহির করিল—অক্ষরগুলা সব দাঁতের সারির মতো, যেন শত শত বিকশিত দন্ত-পংক্তি অদৃষ্টকে ব্যঙ্গ করিতেছে! রায় মহাশয় দ্রুত পাতা উল্টাইতেছিল—হঠাৎ একটি শাদা পাতায় একটি মানুষের ছবি দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল—এই সেই মুখ।

আমরা দ্রুত কাছে আসিয়া লণ্ঠনের আলোয় সেই বীভৎস মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম—পুরন্দরের ও আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—এ সেই চেহারা! তারপরে অনেকক্ষণ কাহারো মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না—সকলেরই বিস্ময় চরমে উঠিয়াছিল।

রায় মহাশয় পুঁথি লইয়া চলিয়া গেল। পরে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, বিমানভাকে সে পুঁথিখানা সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আর সেই পুঁথিখানা পুরন্দরের বাড়ী ত্যাগ করিবার পরে সে বা আমি স্বপ্নে বা জাগরণে কখনো সেই মূর্তি দেখি নাই। তারপরে অনেক কাল গিয়াছে—এ পর্যন্ত পুরন্দরের স্বপ্ন দর্শনের বা আমার জাগরণে দর্শনের কারণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। পুরন্দরের সহিত রায় মহাশয়ের দেখা হইয়াছে—রায় মহাশয়ও আর কখনো সেরূপ স্বপ্ন দেখে নাই। ইহার কার্যকারণ আজ পর্যন্ত আমাদের তিনজনেরই অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

পাশের বাড়ী

সেবারে পূজার ছুটিতে স্বাস্থ্যান্বেষীদের বড় ভিড়। কাছাকাছির মধ্যে সাঁওতাল পরগণায় ছোটনাগপুর অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর যত শহর আছে সবগুলির সবগুলি বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে—অথচ লোক আসার বিরাম নাই। যাহারা বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছে তাহারা জায়গা পাইতেছে, যাহারা অমনি আসিতেছে, স্টেশনে কয়েকঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া অন্য স্থানে যাত্রা করিতেছে; বিরক্ত হইয়া অনেকে আবার কলিকাতাতেও ফিরিয়া যাইতেছে।

প্রফুল্লরা কোনও একটি স্বাস্থ্যকর শহরে একটি বাসার সন্ধান করিতেছিল—কিন্তু সব জায়গা হইতেই খবর আসিতেছে, আর কয়েকদিন আগে চেষ্টা করিলেই বাড়ী পাওয়া যাইত—এখন নিরুপায়। প্রফুল্লরা প্রায় যখন হতাশ হইয়াছে—তখন সিংভূম জিলার কোন একটি ছোট শহর হইতে নরেনের চিঠি আসিল। নরেন প্রফুল্লর সহপাঠী। এখন উক্ত স্থানে সে কাঠের ব্যবসা করে। নরেন লিখিয়াছে যে একটি বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে, বাড়ীটি ছোট তবে নূতন, স্থানের অভাব রঙের জৌলুসে পূরণ করিয়া দিতে পারিবে, আর ভাড়াটাও চাহিদার তুলনায় সাধ্যের একেবারে বাহিরে নয়।

প্রফুল্ল আনন্দিত হইয়া টেলিগ্রাফ করিয়া দিল—"এনগেজ এট্‌ওয়ান্স"—অর্থাৎ এখনি ভাড়া করিয়া ফেলো।

নরেন তারে জবাব দিল—"এনগেজড্ স্টার্ট"—ভাড়া করা হইয়াছে, রওনা হও।

পরদিন প্রফুল্ল তাহার স্ত্রীপুত্র ভাই বোন ও একটি চাকরসহ উক্ত স্থানে যাত্রা করিল।

স্থানটির নাম যে কেন গোপন রাখিতেছি গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বেলা আড়াইটার সময়ে প্রফুল্ল সপরিবারে নির্দিষ্ট স্টেশনে আসিয়া নামিল —নরেন প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিল, সে প্রফুল্লদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নরেন আগেই কয়েকখানা সাইকেল রিক্সাকে বলিয়া রাখিয়াছিল, এবারে সকলে সেই রিক্সা-যোগে বাড়ীর দিকে চলিল; মিনিট কুড়ি পরে তাহারা সেখানে আসিয়া পৌছিল। প্রফুল্লরা দেখিল সত্যই বাড়ীটি নূতন আর সুন্দর, অবশ্য ছোট সন্দেহ নাই, তবে তাহারাও তো সংখ্যায় অগুনতি নয়, তাছাড়া বাড়ীর কম্পাউণ্ড বেশ বড়। দিনের বেলায় সেখানে কাটাইলেই চলিবে, খোলা হাওয়ায় থাকিতেই এখানে আসা।

প্রফুল্ল নরেনকে সঙ্গে করিয়া কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঘুরিয়া চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইতেছিল—

নরেন বলিল—এবার বড় ভিড়, চালাঘরখানা অবধি পড়ে নেই।

প্রফুল্ল শুধাইল—এমন কি প্রতিবছর হয়?

—আরে রাম! সব পড়ে থাকে, এবারে একটা বাড়ীও খালি নেই। কত চেষ্টা ক'রে যে এই বাড়ী পেয়েছি—

—আচ্ছা ঐ বাড়ীটা যেন খালি মনে হচ্ছে—

এই বলিয়া সে অদূরবর্তী পাশের বাড়ীটা দেখাইল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের প্রচুর প্রাচীন গাছপালার মধ্যে মস্ত একটা বাড়ী।

নরেন বলিল—ও একটা পুরনো বাড়ী।

—যে চাহিদা তাতে পুরনো আর নতুন।

—ও বাড়ী ভাড়া দেয় না।

—বাড়ীওয়ালা আসে বুঝি?

—কখনো তো দেখিনি।

—আশ্চর্য! ভাঙাচোরা বুঝি?

এমন কিছু অব্যবহার্য নয়।

ভাড়া বেশী বলে মনে হয়।

—অসম্ভব নয়। তাছাড়া ও বাড়ীটা সম্বন্ধে—এমন সময়ে চায়ের ডাক পড়িল, আলাপের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, দু'জনে ফিরিয়া আসিল।

শহরের কাছেই সুবর্ণরেখা নদী। নদীর একস্থানে কতকগুলো বড় বড় পাথরের খণ্ড পড়িয়া আছে। আগন্তুকগণের সেটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। কলিকাতার

বাবুরা আসিয়া সে স্থানটা দেখিতে যায়। শূন্য নদী-খাতে শুষ্ক পাথরের খণ্ডগুলি দেখিয়া 'আহা আহা' করে, ফটো তুলিয়া নেয়, এবং জ্যোৎস্না রাত্রে সেখানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা বুঝিতে পারে না সেখানে এমন কি দেখবার আছে, ভাবে কলিকাতার বাবুদের দৃষ্টিই আলাদা।

সেদিন প্রফুল্ল ও নরেন সন্ধ্যার আগে সেখান হইতে ফিরিতেছিল। যখন তাহারা বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে প্রফুল্লর চোখ সেই পাশের বাড়ীর দিকে পড়িল, সেদিনের অসম্পূর্ণ আলাপ তাহার মনে পড়িল। শুধাইল—সেদিন এই বাড়ীটার কথা কি বলছিলে ?

নরেন বলিল—হাঁ, বাড়ীটা হানা-বাড়ী।

কৌতূহলী প্রফুল্ল শুধাইল—কিছু দেখেছ ?

—না, শুনেছি।

—কি শুনেছ ?

—বাড়ীটায় রাত-বিরেতে নাকি আলো দেখা যায়, মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যায়, ওখানে নাকি কে আত্মহত্যা করেছিল।

—প্রমাণ কি ?

—আরে প্রমাণ নেই, সেই তো ভয়! তাছাড়া এসব জিনিস কখনো প্রমাণ হয় ?

—কেউ সন্ধান করেনি ?

—স্থানীয় লোক ভয়ে ওখানে প্রবেশ করে না।

প্রফুল্ল বাড়ীটার দিকে তাকাইল। ছমছমে অন্ধকারে প্রকাণ্ড বাড়ীটা মুখ ভার করিয়া দণ্ডায়মান। প্রফুল্লর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নরেন বলিল—মেয়েদের এসব কথা বলো না, অযথা ভয় পাবে। তবে দেখো কেউ যেন ওদিকে না যায়, বিশেষ সন্ধ্যার পরে।

দু'জনে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। যখন দু'জনে চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছে—প্রফুল্লর ছোট ভাই টেবিলের উপর কতকগুলি শিউলি ফুল রাখিল।

প্রফুল্ল শুধাইল—কোথায় পেলিরে ?

সে বলিল—পাশের বাড়ীতে প্রচুর আছে।

নরেন বলিল—এ যে সন্ধ্যাবেলাকার ফুল, এখনো সব ফোটেনি।

গীতীশ বলিল—এখনি তুলে আনলাম, কত ফুল ওখানে।

নরেন প্রফুল্লর দিকে তাকাইল।

রাত্রে শয়নের পূর্বে প্রফুল্ল পত্নীকে বলিল—গীতীশ সেই যে ফুলগুলি তুলে এনেছে, ভালো করেনি।

পত্নী ভাবিল পরের বাড়ীর ফুল মনে করিয়া প্রফুল্ল একথা বলিতেছে, তাই বলিল—খালি বাড়ী—আনলোই বা!

—সেই জন্যই তো বলছি।

—কেন, কি হ'ল?

তখন সবিস্তারে সব কথা প্রফুল্ল তাহাকে বলিল—এবং সাবধান করিয়া দিল—একথা যেন ছেলেমেয়েদের না বলা হয়!

—নিশ্চয়, একথা কি আর বলতে আছে বলিয়াই পত্নী তখনি গৃহান্তরে গিয়া তাহার দুই ননদকে ও গীতীশকে সব বলিয়া ফেলিল—কিছু রঙ চড়াইয়াই বলিল।

বড় ননদ ফুলু বলিল—তাই বলো বৌদি, ও বাড়ীটার দিকে তাকালেই গা ছমছম করে।

ছোট ননদ টুলু বলিল—আমি কাল রাতে একবার ছাদে গিয়েছিলাম, মনে হ'ল বাড়ীটার জানালায় যেন আলো!

গীতীশ কিশোর বালক, ভয় পাইয়াছে বলা চলে না, কিন্তু যেখানে তাহার দুই বোন একরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, সেখানে তাহার অন্যরূপ বলা চলে না, তাই বলিল—আমি যখন আজ সন্ধ্যাবেলা ফুল আনতে যাই, মনে হ'ল বাড়ীর দোতলার বারান্দায় একটা যেন Shadow। তারপর বলিল—অবশ্য ভূতে আমি বিশ্বাস করি না।

ফুলু বলিল—ভারী বীর কিনা! তবে Shadow কিসের?

—অবশ্যই মানুষের!

—তবে মানুষটা দেখতে পেলে না কেন?

—অন্ধকার ব'লে।

—আহা কি বুদ্ধি! অন্ধকারে মানুষ দেখা গেল না—অথচ ছায়া দেখা গেল! একি হয় নাকি?

তাহাদের বৌদি জয়ন্তী বলিল—হয় কি নয় সে তর্ক থাক। ওদিকে আর যেও না। আর এক কাজ করো—ওদিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়ো। সেদিন এই পর্যন্তই।

পরদিন নূতন কৌতূহলে সকলে পাশের বাড়ীর দিকে তাকাইল। ও-বাড়ীতে একটু শব্দ হইলেই,—যদি একটা কাক জোরে ডাকে বা একটা জানালা খট্‌ করিয়া পড়ে সকলে নূতন অর্থ-ভরা চাহনিতে পরস্পরের দিকে তাকায়। অবশ্য প্রফুল্ল এর মধ্যে নাই, কথাটা তাহার মনের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় প্রফুল্ল নরেনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাহার স্ত্রী দুই বোন ও ভাই বসিয়া জটলা করিতেছে, পুরনো চাকর প্রফুল্লর ছোট ছেলে ও মেয়েকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে।

ফুলু বলিল—বৌদি, কাল রাত্রে ওদিকে যেন একটা চাপা কান্না উঠছিল।

টুলু বলিল—আমিও শুনেছি।

গীতীশ বলিল—কুকুর কেঁদে থাকবে।

ফুলু ও টুলু বিরক্ত হইয়া শুধাইল—তুমি শুনেছ?

—অবশ্য শুনিনি, তবে কুকুর ছাড়া আর কি হবে?

ফুলু বলিল—তবে কেন কথা বলতে এসেছ?

টুলু বলিল—জানো কুকুরে Spirit দেখতে পায়।

সকলের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এমন সময়ে হরি মিনু ও তিনুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হরি বলিল—বৌদি, ও-বাড়ীতে মস্ত একটা হনুমান আছে। গাছের উপর খুব শব্দ করছিল।

চারজনে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল—

—কি ক'রে বুঝলি হনুমান?

—তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় গাছের উপর কি আর লাফাবে?

—সন্ধ্যাবেলায় কি হনুমান লাফায়?

হনুমান যে কখন লাফায় না, জানা না থাকায় হরি বলিল—স্পষ্ট দেখলাম।

—কি দেখলে?

—কালো একটা কি!

—হনুমান কি কালো হয়?

—তাছাড়া আর কি হবে?

—যাই হোক, ওদিকে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেও না—এই বলিয়া বৌদি ছেলেমেয়েদের লইয়া উঠিয়া গেল।

ফুলু বলিল—হরি ওদিকে আর যেও না।

—কেন দিদি!

—কেন নয়! যেও না বলছি।

টুলু বলিল—ও-বাড়ী ভালো নয়!

গীতীশ ঠাট্টার স্বরে বলিল—গোষ্ট!

—মানে ভূত-প্রেত আছে!

হরি বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তাই হবে দিদি! কাল রাতে ও-বাড়ীর জানালায় যেন একটা আলো দেখতে পেয়েছি।

ফুলু ও টুলু সমস্বরে গীতীশের প্রতি বলিল—কেমন এবার হ'ল তো বীরপুরুষ!

—ভূতে কি আলো নিয়ে চলাফেরা করে!

—প্রয়োজন হ'লে করে।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—বেশী বড়াই ক'রো না, টেরটি পাবে।

—ভালোই হবে, একটা নতুন জিনিস জানা যাবে।

তারপরে গীতীশ বলিল—এত তর্কে কাজ কি! ঐ তো ক্যালেণ্ডারে দেখা যাচ্ছে পরশু অমাবস্যা—আমি ঐদিন রাতে যাবো ও-বাড়ীতে, বাজি রাখতে রাজী আছো?

ফুলু বলিল—একশ বার রাজী।

টুলু বলিল—না।

—কেন? হেরে যাবে বলে?

—বিপদ ঘট্‌লে দাদার কাছে কে জবাবদিহি করবে?

—ঐ বলে পিছিয়ে যাওয়া! আচ্ছা, তোমরা বাজি রাখো না রাখো—আমি যাবই।

অনেক হয়েছে—এখন থামো।

পরশুদিন। শনিবারে অমাবস্যা পড়িয়াছে। শনিবারই যথেষ্ট, তার উপর অমাবস্যা। ভূত-প্রেতের বারো পোয়া সুবিধা। আরও একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। সকালবেলার গাড়ীতে প্রফুল্ল নরেনের সঙ্গে টাটানগর বেড়াইতে গেল, বলিয়া গেল, ফিরিতে অনেক রাত হইবে; বারোটার এদিকে নয়।

গীতীশ বলিল—আজ রাত্রে যাবো।

ফুলু বলিল—এমন কাজ ক'রো না।

টুলু বলিল—যাবো মানে অন্ধকারে খানিকটা কোথাও লুকিয়ে থেকে এসে বাহাদুরি করবে যে গিয়েছিলাম।

গীতীশ বলিল—আচ্ছা এক কাজ করো। সন্ধ্যার আগে তোমাদের একখানা রুমাল ঐ বাড়ীটার সামনে রেখে আসবো। তারপরে রাতে গিয়ে ওখানা আনবো। আর কি প্রমাণ চাও?

ব্যাপার শুনিয়া তাহাদের বৌদিদি নিষেধ করিল, বোনেরাও নিষেধ করিল, কিন্তু গীতীশ কিছুই শুনিবে না।

তাহাদের এক ভয় পাছে গীতীশের কোন বিপদ ঘটে। আর এক ভয় পাছে প্রমাণ হইয়া যায় সত্যই ও-বাড়ীতে ভয়ঙ্কর কিছু নাই। পাশের বাড়ীতে ভীতিজনক কিছু আছে সে এক নূতন অভিজ্ঞতা, কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া কত গল্প করা যাইবে—সে সুযোগ তাহারা এমনভাবে নষ্ট করতে চায় না।

কিন্তু সমবয়স্ক মেয়েদের কাছে গীতীশের পৌরুষ আহত হইয়াছে, সে কিছুই শুনিবে না। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও অপরাহ্লে ও-বাড়ীতে রুমাল রাখিতে গেল। দুই বাড়ীর মাঝখানে ছোট একটা প্রাচীর, ডিঙাইয়া অনায়াসে পার হওয়া যায়। ফুলু ও টুলু প্রাচীরের কাছে গেল, গীতীশ রুমাল লইয়া প্রাচীর পার হইয়া ও-বাড়ীর বাগানে ঢুকিল। তাহারা দেখিল বাড়ীটার সমুখে যে বাঁধানো বসিবার জায়গা আছে, সেখানে গীতীশ রুমালখানা রাখিল, তারপরে সে ফিরিয়া আসিয়া প্রাচীর পার হইল।

—কেমন দেখলে তো যে রুমাল রেখে এলাম।

গীতীশ কিছুতেই নিষেধ শুনিবে না। শেষ মুহূর্তে তাহার দুইবোন ও বৌদি কত করিয়া বারণ করিল, হাতে ধরিল—কিন্তু সে অটল।

অগত্যা তাহারা নিরস্ত হইল।

রাত বারোটার কাছাকাছি গীতীশ একখানি লাঠি হাতে রওনা হইল।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার বোন ও বৌদিরা ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আশা-আশঙ্কায় মিনিট গণিতে গণিতে দেখিতে লাগিল। তাহারা দেখিল গীতীশ ধীরে ধীরে প্রাচীরটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, এবারে প্রাচীরের উপরে উঠিল, ঘন অন্ধকারেও বেশ বুঝিতে পারা

যাইতেছে। এবারে খুব সম্ভব সে ওপারে নামিয়াছে, কারণ তাহার শাদা জামাটা আরও অস্পষ্ট, এবার আরও অগ্রসর হইয়া গেল—না! আর কিছু দেখা যাইতেছে না। বোধ করি গাছে আড়াল করিয়াছে! মেয়ে তিনটির ভয়ে নিঃশ্বাস পড়িতেছে না! কতক্ষণ হইল! এক মিনিট, তিন মিনিট, না দশ মিনিট! ভয়ের মুহূর্ত আর ফুরাইতে চায় না!

এমন সময়ে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া গীতীশের আর্তস্বর উঠিল!

আলো হাতে করিয়া মেয়েরা, প্রাচীরের দিকে ছুটিয়া গেল!

প্রাচীরের কাছে এদিকে শাদা কি একটা বস্তু! লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল—মূর্ছিত গীতীশ!

'জল আন্, পাখা আন্, স্মেলিং সল্ট আন্!'

বিপদের উপর বিপদ। এমন সময়ে প্রফুল্ল ও নরেন আসিয়া উপস্থিত। তাহারা এইমাত্র স্টেশন হইতে আসিতেছে, বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র কোলাহল শুনিতে পাইয়াছে।

নরেন বলিল—সব বুঝেছি! কি সর্বনাশ! প্রফুল্ল বলিল—লক্ষ্মীছাড়া বুঝি বাহাদুরি দেখাইবার জন্যে ও-বাড়ী গিয়েছিল।

—নাঃ ভয় নেই, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকই পড়ছে—নরেন ইতিমধ্যে তাহার বুকে পিঠে হাত দিয়া দেখিয়া লইয়াছে।

তখন সকলে মূর্ছিত গীতীশকে তুলিয়া লইয়া ঘরে গেল। শেষ রাতে তাহার মূর্ছা ভাঙিল বটে, কিন্তু এত দুর্বল যে কথা বলিতে পারিল না। নরেনের আর সে রাত্রে বাড়ী যাওয়া হইল না। সারা রাত্রির সেবা-শুশ্রূষার পরে গীতীশ এতক্ষণে সম্পূর্ণ সম্বিৎ ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। প্রথম কথাই সে বলিল—রুমালখানা কই? সেখানা আমার সঙ্গে এনেছিলাম।

—কিন্তু ভয় পেয়েছিলে কেন? কিছু দেখনি কি?

—সে আমি বলত পারবো না! শাদা শাদা অনেকগুলো মূর্তি!

—তখনি বলেছিলাম যেও না!

গীতীশ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—ও বাবা!

এমন সময়ে বাহিরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

নরেন বলিল—দেখো তো প্রফুল্ল ব্যাপারটা কি?

প্রফুল্ল জানালায় উঁকি মারিয়া বলিল—এ আবার কি? পাশের বাড়ীটা যে পুলিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে!

—সত্যি ? তাইতো দেখি ! আবার কি রহস্য ?

রহস্যভেদের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিতেই একজন দারোগা নরেনকে বলিল—যাক্, আপনি আছেন আর ভয় নেই।

—কি হয়েছে ?

—একবার কষ্ট ক'রে সার্চ ওয়ারেণ্টের সাক্ষী হবার জন্য ও-বাড়ীতে যেতে হবে।

—কি ব্যাপারটা আগে শুনি।

—আজ কয়েকদিন হ'ল ওখানে কয়েকজন ফেরারী আসামী বাস করছিল। খুঁজতে খুঁজতে এইমাত্র সন্ধান পেয়ে তাদের Arrest করেছি !

—ওটা না ভূতের বাড়ী ?

—সেই ভয়ের সুযোগ নিয়েই ওখানে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল, ভেবেছিল কেউ সন্দেহ করবে না।

—ক'জন লোক ?

—ছ'জন।

—চলো প্রফুল্ল, একবার ঘুরে আসি।

—চলো, পাশের বাড়ীটা দেখবার কৌতূহল ছিল, দেখা হয়ে যাক্।

নরেন দারোগার উদ্দেশে বলিল—চলুন যাওয়া যাক।

তাহারা তিনজনে পাশের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

খেলনা

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন ভূতের গল্প গল্পের রাজা। কথাটা মিথ্যা নয়। ভূত আছে কিনা জানি না, তবে গল্পে বর্ণিত ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে গল্প বলিবার ভঙ্গির উপরে। হাঁ, বিনয়বাবু গল্প বলিতে পারেন বটে। আমরা পাঁচ-সাতটি বয়স্ক জীব 'পততি পতত্রে' অবস্থায় জড়সড় হইয়া বসিয়া আছি।

বাহিরে অবিশ্রাম ধারা পতন শব্দ, তার সঙ্গে মিশিয়াছে একটানা ঝিঁঝির ডাক, ঘনান্ধকার শ্রাবণ রাত্রির যেন মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। মাঝে মাঝে স্বপ্নগ্রস্তের গর্জনের মতো চাপা মেঘের গরগর ধ্বনি, ঘরের জানলা দুটো খোলা রহিয়া রহিয়া ভিজা হাওয়ার দমকা ঘরে ঢুকিয়া মোমবাতির শিখাটাকে নাচাইয়া দিতেছে, ঘরময় আলোছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ হেন অবস্থায় আমরা পাঁচ-সাতজনে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছি —স্বতন্ত্র একখানি চেয়ারে বসিয়া বিনয়বাবু গল্প বলিতেছেন।

প্রথমে কিভাবে ভূতের গল্পের সূত্রপাত হইল মনে নাই, খুব সম্ভব স্থানকালের মাহাত্ম্যে গল্পের স্রোত আপনি ভূতের গল্পের মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িল, বিনয়বাবু সেই মহাসমুদ্রের কর্ণধার হইয়া বসিলেন। হাঁ, তিনি গল্প বলিতে জানেন বটে, এতদিন তাঁহাকে নিপুণ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মাত্র বলিয়া জানিতাম।

"হাঁ ব্রহ্মদৈত্যের কথা যদি উঠল, তবে শুনুন একটা ঘটনা দেখেছিলাম বটে—"

বিনয়বাবুর গল্পের ধারার আর শেষ নাই, এতও জানেন, আর সবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

অনাদিবাবু বলিলেন, বিনয়বাবু—একটু দয়ামায়া রেখে বলবেন, এই অন্ধকারে বাড়ী ফিরতে হবে।

আহা থামুন না, বলুন বিনয়বাবু—কথাগুলি বলিলেন বৈদ্যনাথবাবু। তাঁহারই বাড়ী, কাজেই তাঁহার বাড়ী ফিরিবার সমস্যা নাই।

প্রমথবাবু বলিলেন, না হয় এখানেই কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলে হবে, বলুন বিনয়বাবু।

"ময়নাডাঙা বলে সাঁওতাল পরগণার একটা গাঁয়ে গিয়েছিলাম একটা রুগী দেখতে। কতদিন আগে, বোধ করি বছর দশেকই হবে, ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে নেমে এল এমনি অন্ধকার আর এমনি দুর্যোগ—"

সন্ধ্যা হইতে গল্প চলিতেছে, আমরা সকলেই সাধ্যমতো দুটি একটি গল্প বলিয়াছি যদিচ বিনয়বাবুর গল্পের তুলনায় সে সব কিছুই নয়, কিন্তু গদাধরবাবু একেবারে নীরব। তিনি প্রথম হইতে এ পর্যন্ত একটি শব্দও করেন নাই, গল্প বলিবার অনুরোধ অজ্ঞতার অজুহাতে এড়াইয়া গিয়াছেন। সেই হইতে গালে হাত দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। আমরা সকলেই পরস্পরকে দীর্ঘকাল জানি, কেবল গদাধরবাবুই নবাগন্তুক; ছোট একটি বাসা ভাড়া লইয়াছেন; সংসারে তিনি আর তাঁর স্ত্রী; দু'জনেরই বয়স হইয়াছে, সন্তানাদি নাই; তাঁহারা কাহারো সঙ্গে বড় মেশেন না; মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় তিনি বৈদ্যনাথবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন, আজও আসিয়াছিলেন এবং ভূতের গল্পের ফাঁদে ধরা পড়িয়া আটকাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখা যায় না বলিলেই হয়।

বিনয়বাবুর ব্রহ্মদৈত্যের অভিজ্ঞতা শেষ হইলে সকলে আরও জমাট বাঁধিয়া বসিল, এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল ভূত দেখিবার আগ্রহ কাহারো নাই, এমন কি এমন সাহসী বিনয়বাবু অবধি বলিয়া ফেলিলেন, যা দেখেছি, নূতন করে দেখবার আর শখ নেই, ওতে নার্ভ-এর উপরে বড় পীড়ন হয়ে থাকে।

আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

সকলে গদাধরবাবুর কথায় চকিত হইয়া উঠিয়া শুধাইল, কেন বলুন তো।

পরলোকগত আত্মাকে দেখবার আগ্রহ যে কি অসীম তার একটি ঘটনা জানি।

বলুন, বলুন।

এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন কেন?

গদাধরবাবু আরম্ভ করিলেন, আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, গল্পের সূত্রে নিঃসঙ্গ নিভৃতচারী এই পরিবারটির অন্তরঙ্গ রহস্যের কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইব আশাতে।

এক শহরে এক নববিবাহিত দম্পতি ছিল, নবীন তাদের বয়স, গভীর তাদের প্রেম, টাকাকড়ি তাদের বেশী ছিল না, কিন্তু তারা পরস্পরকে নিয়ে এমনি বিভোর হ'য়ে ছিল যে সামান্য অন্নবস্ত্রের অভাব তাদের চোখেই পড়ত না। বিবাহের কয়েকবছর পরে তাদের চূড়ান্ত সৌভাগ্যকে উজ্জ্বল করে একটি কন্যা জন্মালো। পাহাড়ের চূড়ায় পড়ল বালার্ক কিরণ। মেয়েটি হ'ল তাদের ধ্যান-জ্ঞান-জীবন, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের বাহ্যপ্রতীক। দীঘির জল যতই বাড়ে পদ্মের নাল ততই লম্বা হয়, জলতল পদ্মকে আর স্পর্শ করতে পারে না। বাপ-মায়ের ভালোবাসা প্রতিদিন ফেঁপে উঠছে কিন্তু তবু যেন মেয়েকে আচ্ছন্ন করতে পারতো না, একটুখানি ফাঁক আর পূর্ণ হ'তে চায় না। ঐ যে একটুখানি অপূর্ণতা হয়তো ওতেই প্রেমের মাধুর্য।

ওরা যে বাড়ীতে থাকতো সেটা বড় নয়, গোটা তিনেক মাত্র ঘর। যে ঘরটায় মেয়েকে নিয়ে ওরা শুতো, তার পাশের ঘরটা ছিল মেয়ের খেলার ঘর। এখন তার বয়স তিন। ছোট্ট ঘরটি বাপ-মায় মিলে নানারকম পুতুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল। বাপ যেতো অফিসে, মা যেত রান্নাঘরে, মেয়েটি খেলাঘরে বসে আপনমনে খেলনাগুলো নিয়ে খেলা করতো। সন্ধ্যাবেলায় বাপ-মা এসে যোগ দিতো তার খেলায়। কতরকম খেলা। বাপ সাজতো খদ্দের, মা সাজতো ফুলওয়ালী, মেয়েটি সাজতো দোকানী— এইরকম কত কি। আবার পুতুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে যে কথাবার্তা বলতো, বাপ-মাকে তা শুনতে হ'ত, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অপটুতা বা শক্তিহীনতার অজুহাত একেবারেই চলতো না, আর পুতুলের বিয়ের ঘটকালি! সে তো বাপের অবশ্য কর্তব্যের প্রধানতম অঙ্গ, ঘটক বিদায়ের ভার যেমন মায়ের উপরে। এমনি চলতো ঘুমে তার চোখ ভরে আসা অবধি। বাপ-মায়ে ভাবতো সন্ধ্যা সারাদিনব্যাপী হয় না কেন?

তাদের ভাবনাই শেষে সত্য হ'ল, সন্ধ্যার অন্ধকার দিনের আলো মুছে দিয়ে জীবনব্যাপী হ'ল, মাত্র তিন দিনের অসুখে অসমাপ্ত পুতুলখেলা ফেলে রেখে মেয়েটি চলে গেল।

বাপ-মায়ের মনের অবস্থা বর্ণনা করতে আমি পারবো না, অতএব সে চেষ্টা থাক। শুনেছি শোকে লোক পাগল হয়ে যায়, তারা তো সুখী, আপন দুঃখ বুঝতে পারে না। লোকে কান্নাকাটি করে, তারাও সুখী

বুকের ভার গ'লে নেমে যায়। ওরা না হ'ল পাগল, না করলো কান্নাকাটি, কেবল পরস্পরের চোখের দিকে কখনো তারা তাকাত না, পাছে প্রকৃতিস্থতার ছলনাটুকু এক নিমেষে ভেসে যায়। বাইরে থেকে সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো তবে খেলাঘরটি মেয়ের জীবনকালে যেমন ছিল তেমনি রইলো, খেলনাগুলি গুছিয়ে একদিকে রেখে দিল পারতপক্ষে সেখানে তারা কখনো ঢুকতো না।

একদিন অনেক রাত্রে বাপ ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেল পাশের ঘরে শব্দ, ঠিক কে যেন খেলনাগুলো নাড়ছে। সে ধীরে ধীরে পত্নীকে ডাকলো; সে জেগেই ছিল, বলল আমি অনেকক্ষণ থেকে শুনছি।

ও ঘরে যাবে কি ?

পত্নী কি ভেবে বলল, না, না। এমনি কিছুক্ষণ চললো, তার পরে শব্দ থেমে গেল; ওরা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠেই ওরা খেলাঘরে প্রবেশ করলো, এ কি! বাক্সবন্দী খেলনাগুলি কে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রেখেছে, ঠিক যেমন ক'রে ওদের মেয়ে পরী সযত্নে সাজিয়ে রাখতো। এই প্রথম ওদের চোখে জল এল, ওরা জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইলো, কেবল দু'জনের চোখে কয়েকটি জলধারা গড়াতে লাগলো। লুব্ধ প্রত্যাশায় ওরা খেলনাগুলো গুছিয়ে রেখে চলে এল।

সেদিন অনেক রাত্রে আবার ওরা ঘুম ভেঙে সেই শব্দ শুনতে পেলো। কে যেন খেলনাগুলো বের ক'রে সাজিয়ে রাখছে। বাপ বলে উঠল—আমি যাবই, মা হাত ধরে নিষেধ করলো, না, না, ও ভয় পাবে।

তবে কি দেখবো না ?

না, শুনেই সন্তুষ্ট থাকো, দেখা দেবার হ'লে আপনি দেখা দেবে।

কিছুক্ষণ পরে, বোধ করি খেলনাগুলো সাজানো হ'য়ে গেলে শব্দ থেমে গেল। ওরাও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন খেলাঘরে ঢুকে ওরা দেখলো আগের দিনের মতো খেলনাগুলো সাজানো।

ওরা খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখলো।

সেদিন রাত্রে ওরা আর ঘুমোল না, জেগেই রইলো। অনেক রাত্রে খেলাঘরে কার ছোট্ট দুটি পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। খেলনাগুলো বার

করবার শব্দ, সেই সঙ্গে—অভিমানী কণ্ঠস্বরের মৃদু কুণ্ঠিত—"রোজ রোজ সাজিয়ে রাখি, রোজ রোজ কে নষ্ট করে দেয়।"

এ স্বর কি চিনতে ভুল হ'তে পারে? এ যে তাদের হৃদয়ে বেদনার বজ্রাঙ্কুশে খোদিত, দু'জনে একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল—আর দু'জনে একত্রে খেলাঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো। ঘর শূন্য। খেলনাগুলো মেঝের উপর ছড়ানো, সাজাবার সময় হয়নি।

দু'জনে এদিকে ওদিকে দেখলো, বাইরে দেখলো, সর্বব্যাপী অন্ধকার ছাড়া কিছু কোথাও নেই। তখন তারা খেলনাগুলো বুকে জড়িয়ে ধরে মেঝের উপরে পড়ে সারারাত্রি কাঁদলো—ওরে বাছা, ওরে পরী, তোর হাতের শব্দ শুনবার আশাতেই আমরা খেলনাগুলো বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখতাম। অভিমান করিসনে। দেখা দে।

কিন্তু সেই শেষ, আর না পেয়েছে তারা শব্দ, না শুনেছে সে কণ্ঠস্বর। কত দীর্ঘ রাত তারা বিনিদ্র কাটিয়েছে, কতবার খেলাঘরে চুপি চুপি উঁকি মেরেছে, কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। সেই অভিমানসিক্ত কণ্ঠস্বর, অশ্বত্থপত্রশীর্ষে দোদুল্যমান অশ্রুবিন্দুর মতো তাদের হৃদয়ের প্রান্তে রয়ে গিয়েছে, এখনো আছে—ঘটনার আজ কুড়ি বৎসর পরেও।

কিছুক্ষণের জন্য গদাধরবাবু থামলেন, তারপরে বললেন, পরলোকগত আত্মা দেখবার কি আগ্রহ জানে তারা, সেই হতভাগ্য পিতামাতা।

গল্প শেষ হ'ল।

এই আবছায়া আলোতেও দেখতে পাওয়া গেল গদাধরবাবুর চোখে কুড়ি বৎসরের পুরাতন সেই অশ্রুবিন্দু তেমনি দুলছে। বুঝতে পারা গেল কারা সেই হতভাগ্য পিতামাতা।

আসর ভঙ্গ হ'ল, বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য ধরেছিল, সেই সুযোগ নিয়ে সবাই নীরবে চলে গেল। আমি একা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

দেখলাম শ্রাবণের রাত্রি তেমনি ঘনান্ধকার দুর্যোগময়ী। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ডালপালা মেলায় যে আলোকটুকু হচ্ছিল, যে-দৃশ্যটুকু ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হচ্ছিল তাতে ক'রে সে রাত্রিকে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ঙ্করী বলে আর মনে হ'ল না, মনে হ'ল এর মধ্যেও কোথায় যেন একটুখানি মাধুর্য, কোথায় যেন একটুখানি সৌন্দর্য আছে, সদ্যমৃতের ওষ্ঠাধরে সহজ প্রসন্ন হাসির রেখাটির মতো।

দ্বিতীয় পক্ষ

দেখ, ওঠ, ওঠ,—নূতন বধূ নীলিমা শেষ রাত্রে স্বামীকে ঠেলা মারিয়া জাগাইয়া দিল। অন্নদাপ্রসাদ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, শুধাইল—কি হয়েছে নীলি?

নীলিমা বলিল—আমার কেমন ভয় করছে।

অন্নদা সান্ত্বনার ও জিজ্ঞাসার স্বর মিশাইয়া বলিল—ভয় কিসের?

—বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

—কি বল তো?

বধূ বলিতে লাগিল—যেন কে আমার শিয়রের কাছে বসে ছিল; ঘুম ভেঙে গেল; আবার ঘুমালাম—আবার তাকে দেখলাম, লাল শাড়ী-পরা, গায়ে ফুলের গহনা, যেন সে-ও এক নূতন বউ!

অন্নদা পরিহাস করিয়া বলিল—ওঃ, তাহলে নিজেকেই দেখেছ?

বধূ বলিল—না, তার মুখে যেন কত দুঃখের চিহ্ন, এমন বিষন্ন চোখ আমি দেখিনি।

এক মুহূর্তের জন্য অন্নদাপ্রসাদের মুখ কালো হইয়া গেল, কিন্তু প্রদীপের স্তিমিত আলোতে তাহা নীলিমার চোখে পড়িল না।

স্বামী বলিল—কিছু ভয় নেই লক্ষ্মীটি, আমি আছি, ঘুমোও। ভীত নীলিমা স্বামীর বুকের কাছে আশ্রয় লইয়া শুইয়া পড়িল।

দিনের বেলায় এ বিষয়ে আর কেহ কোন কথা তুলিল না, বাড়ীতে গোটা-দুই চাকর ছাড়া তৃতীয় আত্মীয়-স্বজন কেহ না থাকাতে স্বভাবতঃই এ-বিষয়ে কাহাকেও বলিবার সুযোগ নীলিমার ছিল না।

কিন্তু রাত্রিতে আবার নীলিমা জাগিয়া উঠিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল—ওগো শুনছো, ওঠ, ওঠ।

—আবার কি হ'ল? অন্নদাপ্রসাদ জাগিয়া উঠিল।

—সেই স্বপ্ন আবার দেখেছি।

—কি, বল দেখি। অন্নদাপ্রসাদ আগের রাতের ঘটনা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

বধূ বলিল, লাল শাড়ী আর ফুলের গহনা-পরা কে একজন যেন আমার শিয়রের কাছে—

নীলিমার মুখের অর্ধসমাপ্ত বাক্যকে পূরণ করিয়া অন্নদাপ্রসাদ বলিল—চুপ ক'রে বসে ছিল। এই তো—তা থাকুক না।

নীলিমা বলিল—না, আজ সে কথা বলেছে।

—কথা? অন্নদা চমকিয়া উঠিল।—কি কথা?

—সে বলছিল আমাকে ঠেলা মেরে, 'তোর জায়গায় যা', এখানে কেন?'

অন্নদাপ্রসাদ এবারে সত্যই চমকিয়া উঠিল। এমন সময়ে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল—অজ্ঞাতসারে তাহারা পরস্পরের কাছে সরিয়া আসিল; আর সেই শীতের রাত্রেও দু'জনের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমিতে লাগিল—অন্ধকার বলিয়া কেহ দেখিতে পাইল না।

স্বামী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—ও কিছু না। অমন হ'য়ে থাকে।

—কেন হয় বল না?

অন্নদা আর কিছু বলিবার পাইল না, তাই বলিল—আচ্ছা, কাল বুঝিয়ে দেব। সে শুইয়া পড়িল—বধূ তাহার কোল ঘেঁষিয়া শুইল।

প্রবীণ পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে নীলিমা অন্নদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পক্ষের বধূ। প্রথম পক্ষের বধূ শ্রীলেখা তিন বছর ঘর করিবার পরে কয়েকমাস আগে মারা গিয়াছে। অন্নদার পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু না করিবারও কোন কারণ ছিল না; তাহার বয়স সবে সাতাশ; সন্তানাদি নাই, প্রচুর টাকাকড়ি আছে। শেষে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সে নীলিমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ অনুমান করিতে পারে নাই যে অন্নদার দ্বিতীয় পক্ষ; কেমন করিয়া পারিবে! সাতাশ বছর বয়স বিবাহের পক্ষে বেশী নয়—আজকালকার বিচারে কিছু কমও হইতে পারে। কথা যখন উঠিল না অন্নদাও চাপিয়া গেল; শুধু তাই নয়, পাছে দ্বিতীয় পক্ষ জানিয়া নীলিমা ব্যথা পায়, তাই সে বিবাহের পরে দেশে না ফিরিয়া পশ্চিমের এক শহরে চলিয়া গেল; আর শ্রীলেখার চিহ্ন যতদূর সম্ভব মুছিয়া ফেলিল; চিঠিগুলি ছিঁড়িল; ফটোগুলি

পুড়াইল; তাহার ব্যবহৃত শাড়ী জামা গরীবদের বিলাইয়া দিল। সে ভাবিয়াছিল কখন হয়ত কথায় কথায় নীলিমাকে শ্রীলেখার কথা বলিবে—কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহা আর সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

সেদিন দুপুরবেলা অন্নদা রোদে বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল আর নীলিমা প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ খুলিয়া কতকগুলি শাড়ি ও ব্লাউজ বাহির করিতে করিতে বলিল—দেখ, অন্য কোন দিকে তোমার দৃষ্টি নেই, কিন্তু বিয়ের আগেই এতগুলো শাড়ী কিনতে গেলে কেন?

অন্নদা হাসিয়া বলিল—কবে যুদ্ধ বেধে যায়—তখন তো আবার চড়া দামে কিনতে হ'ত!

—কিন্তু ব্লাউজ যে এতগুলো করিয়ে রেখেছ বোকার মতো, যদি আমার গায়ে ছোট হ'ত, কি বড় হ'ত!

অন্নদা পুনরায় হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল—কিন্তু ছোটও হয়নি, বড়ও হয়নি, ঠিকই হয়েছে তো!

—তা হয়েছে বটে! নীলিমা ভাঁজ খুলিয়া একে একে বস্ত্রাদি রোদে দিতে লাগিল।

না হইবার কথা। শ্রীলেখা আর নীলিমা দু'জনে প্রায় এক মাপেরই। এ সমস্তই শ্রীলেখার; তবে তাহাতে ব্যবহারের কোন চিহ্ন নাই বলিয়া, আর দামও অনেক, অন্নদা সেগুলি পরিত্যাগ করে নাই।

নীলিমা কৌতূহল ও আবদারের স্বরে শুধাইল—আচ্ছা, কি ক'রে তুমি আমার ঠিক মাপটি জানলে?

অন্নদা বলিয়া ফেলিল—তা জান না? বিয়ের আগে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম—

কিন্তু কথাটা হঠাৎ-দেখা সাপের মতো দু'জনকেই চমকাইয়া দিল; স্বামী অস্বস্তি বোধ করিল, বধূর রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল।

সে বলিল—আচ্ছা, এই যে আমি রাতের পর রাত ঐ একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি, এর কোন প্রতিকার করবে না?

অন্নদা বলিল—স্বপ্নের আর প্রতিকার কি? আর তোমার কিছু ক্ষতিও তো হচ্ছে না।

নীলিমা বলিল—আমার কি মনে হয় জান—অন্নদার বুক কাঁপিয়া উঠিল—মনে হয় এ বাড়ীতে কোন প্রেত বাস করে; সে চায় না যে আমি

এখানে থাকি, তাই ক্রমাগত বলে, এখানে কেন? তোর জায়গায় যা! তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আচ্ছা, বাসাটা বদলালে হয় না!

অন্নদা কথাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল—আচ্ছা দেখা যাবে।

অবস্থা ক্রমে অধিকতর সঙ্কটজনক হইতে লাগিল। নীলিমার ঘুমাইবার উপায় আর রহিল না। একটু ঘুম আসিয়াছে কি, অমনি সে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—ওগো, শুনছ, আবার সেই মূর্তি। অন্নদা কতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে? অল্পক্ষণ পরেই সে ঘুমাইয়া পড়ে—নীলিমা স্থির করে, সে আর ঘুমাইবে না, বাকী রাতটুকু জাগিয়া কাটাইবে;—কিন্তু ক্রমে জাগরণও অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

নির্জন ঘর, নিঃসঙ্গ প্রহর; স্তিমিত দীপের আলোয় দেয়ালে কিম্ভূত সব ছায়া পড়ে; চোখ বন্ধ করিলে সেই শাড়ী-পরা মেয়েটাকে মনে পড়িয়া যায়; চোখ খুলিয়া থাকিলে দেয়ালের চটা-ওঠা রেখাগুলা ক্রমে রক্তে মাংসে পুরিয়া সজীব হইয়া উঠিতে থাকে!

দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ওটা তো ছায়া! কিন্তু নড়িতেছে কেন? না, নড়িবে কেন? কি আশ্চর্য, এমনভাবে দেয়ালের চটা উঠিয়াছে, ঠিক একটা মেয়েমানুষের চেহারা সৃষ্টি করিয়াছে! শাড়ীটা যেন লাল!

নড়িতেছে নাকি! স্বপ্নে দেখা সেই মানুষ!

নীলিমা চমকিয়া উঠিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরে—অন্নদাপ্রসাদ লাফ দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি, আবার স্বপ্ন দেখলে নাকি?

নীলিমা বলে—আমি তো ঘুমোই নি।

—তবে?

—সে যেন এসেছিল।

—কে?

নীলিমা ভয়ে ভয়ে বলে, পাছে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা, সে শুনিতে পায়—স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটা।

এমন সময় হয়তো প্রদীপটা নিবিয়া যায়, দুইজনে অন্ধকারে বসিয়া ঘামিতে থাকে। নীলিমা বলে—চলো বাসা বদলাই। অন্নদা শুষ্ক কণ্ঠে বলে—আচ্ছা।

অবশেষে বাসা বদলানোই স্থির হইল। অনেক খুঁজিয়া মনের মতো একটা বাসা মিলিল, আগামী কাল সেখানে উঠিয়া যাওয়া হইবে। নীলিমার মন অনেক হাল্কা হইয়া গেল, বহুদিন পরে তার মুখে হাসি দেখা দিল। সারা দিন সে খাটিয়া জিনিসপত্র গুছাইল, বাঁধা-ছাঁদা করিল, কাল সকাল বেলাতেই যাহাতে বাসা ছাড়িতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিল—এমন কি অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা আসন্ন শয্যার কথা মনে পড়িয়া যে আতঙ্ক উপস্থিত হইত, সে-ভাবটাও কমিয়া গেল; বিছানায় শুইতেই তাহার ঘুম আসিল। অন্নদা তাহার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

আজ শেষ রাত্রি। নীলিমা স্বপ্ন দেখিল, সেই মেয়েটি লাল শাড়ীতে ফুলের গহনায় সাজিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল।

নীলিমা বলিল—তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি—আমাকে আর বিরক্ত করিও না।

সেই মেয়েটি বলিল—বাসা ছাড়িলেই কি আমাকে ছাড়িতে পারিবে?

—নয় কেন?

—আমার জায়গা যে অধিকার করিয়া বসিয়াছ!

নীলিমা শুধাইল—তোমার জায়গা! সে আবার কি?

মেয়েটি বলিল—যদি জানিতে চাও, ওঠ।

স্বপ্ন-চালিত নীলিমা উঠিল।

সেই মেয়েটি বলিল—বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে চল।

নীলিমা যন্ত্রের মতো বাহিরে আসিল, শুধাইল কোথায় যাইতে হইবে?

—আমার পিছনে পিছনে এসো।

তাহাকে অনুসরণ করিয়া নীলিমা চলিল। সে ঘর ত্যাগ করিল; আর একটা ঘরও ছাড়িয়া আসিল; তারপরের ঘরে মেয়েটি থামিল—নীলিমা থামিল।

মেয়েটি বলিল—ওই টেবিলের ছোট দেরাজে একটা চাবি আছে, খোলো।

নীলিমা দেরাজ খুলিয়া চাবি লইল। এখন এই ঘরটাতে তাহাদের তোরঙ্গ, বাক্স প্রভৃতি থাকিত।

মেয়েটি বলিল—ঐ হাতবাক্সটা খোলো।

নীলিমা বলিল—ও হাতবাক্স আমার স্বামীর, আমি কখনও খুলি না।

মেয়েটি বলিল—যদি সব জানতে চাও তবে খোলো।

নীলিমা যন্ত্রের মতো খুলিয়া ফেলিল।

—ঐ ডালাখানা তোলো।

নীলিমা তাহাই করিল।

—এবারে ঐ কাগজগুলো সরাও।

নীলিমা সরাইল।

—ঐ দেখ একখানা বড় খাম। ওখানা বাহির করিয়া লও।

নীলিমা বাহির করিল।

—এবার বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি যথাস্থানে রাখ।

নীলিমা সেইরূপ করিল।

তখন মেয়েটি বলিল—এইবারে দেখ খামখানার ভিতরে কি আছে।

নীলিমা একখানা পুরু কাগজ বাহির করিয়া ফেলিল।

মেয়েটি বলিল—ওখানাতে কি আছে দেখ।

এইখানে নীলিমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল তাহার হাতে একখানা ছবি—রক্তাম্বরা, ফুলসজ্জায় সজ্জিতা, বধূবেশিনী সেই স্বপ্নে-দেখা মেয়েটির ফটোগ্রাফ। এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই চীৎকার করিয়া উঠিয়া মূর্ছিত হইয়া সশব্দে মেঝের উপরে পড়িয়া গেল।

সেই শব্দে অন্নদাপ্রসাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল; দেখিল পাশে নীলিমা নাই; নানারূপ শঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। কোথায় গেল সে? নাম ধরিয়া ডাকিল—কেহ উত্তর দিল না। তখন মনে হইল—এইমাত্র একটা শব্দ শুনিল—কিসের শব্দ? সে আলো লইয়া এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল বাক্স রাখিবার ঘরের মেঝেতে নীলিমা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্নদাপ্রসাদের মুখে কথা বাহির হইল না। কিন্তু এমন করিয়া থাকিলে তো চলিবে না। সে জল আনিয়া তাহার মাথায় দিল—পাখা লইয়া বাতাস করিল, নাম ধরিয়া ডাকিল; চেষ্টার পরে নীলিমার মূর্ছা ভাঙিল, জ্ঞান ফিরিল।

সে শুধাইল—তুমি কে?

অন্নদা বলিল—আমি অন্নদা।

নীলিমা শুধু বলিল—ও।

অন্নদা শুধাইল—তুমি এখানে এলে কি ক'রে?

সে বলিল—সেই মেয়েটি নিয়ে এসেছে।

—কোন মেয়েটি ?

—সেই যাকে স্বপ্নে দেখেছি।

অন্নদা বলিল—ও সব বাজে ! তুমি স্বপ্ন দেখে এখানে চলে এসেছ।

নীলিমা দৃঢ়ভাবে বলিল—স্বপ্ন নয়! তারপরে নিজকেই যেন প্রশ্ন করিল—ছবিখানা কোথায় ?

অন্নদা বলিল—ছবি ! কিসের ছবি ?

নীলিমা বলিল—সেই মেয়েটির—সেই এক মুখ, এক সাজ !

সে এদিক-ওদিক তাকাইতে দেখিতে পাইল অদূরে ছবিখানা পড়িয়া আছে, মূর্ছিত হইয়া পড়িবার সময়ে হাত হইতে ছিটকাইয়া গিয়াছিল। সে ছবিখানা তুলিয়া লইয়া বলিল—এই মেয়েটিকেই আমি প্রতিরাত্রে স্বপ্নে দেখি। আজ সে আমাকে বলেছিল, এ বাসা ছাড়লেই আমাকে ছাড়তে পারবে না। তখন সে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে তোমার হাতবাক্স থেকে এই ছবি বার করতে বাধ্য করল। তারপরে বলল—এবারে দেখ। তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি যাকে এতদিন স্বপ্নে দেখেছি—এ ছবি তারই।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে অন্নদাকে জিজ্ঞাসা করিল—ঐ ছবি তোমার বাক্সে এল কি ক'রে ?

অন্নদা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল—বিছানায় চল, সব বলব।

বিছানায় গিয়া অন্নদাপ্রসাদ সব স্বীকার করিল। প্রথম পক্ষের পত্নীর কথা শুনিয়া নীলিমা দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ সে স্মৃতি যাহাতে নীলিমাকে ব্যথিত না করে সে জন্য কত সঙ্কোচে অন্নদা সব দিক বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে জানিয়া স্বামীর প্রতি ভক্তি তাহার বাড়িল।

অন্নদা বলিল—আমি শ্রীলেখার সব স্মৃতি মুছে ফেলেছিলাম, কেবল ঐ ফুলসজ্জার সাজে তোলা ফটোগ্রাফখানা নষ্ট করিনি। কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে তুমি তার খোঁজ জানলে কি ক'রে ?

নীলিমা বলে—সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নইলে আমি কি জানতাম ওটা ওখানে আছে ?

অন্নদা বলে—সে কথা ঠিক। শুনেছি সোম্‌নাবুলিজমে এমন হয়।

পরদিন তাহারা সে বাসা ছাড়িয়া দিল। তাহাদের পরবর্তীকালের ইতিহাস আর জানি না।

STATE CENTRAL LIBRARY W.B.
P Road, Cal